তপস্যার ফল

(উপন্যাস)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩২৫

মূল্য ১॥০ টাকা।

নিউ সরস্বতী প্রেস,
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু।

ভাই মণি,

তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, সেই দিনটী আজও আমার স্মৃতি-পথে উজ্জ্বল হইয়া আছে—তখন সবে মাত্র সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি, তুমিই আমার নিকট প্রথম আগ্রা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থান সকলের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া সেগুলি দেখিবার অদম্য বাসনা অন্তরের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছিলে। আজ ভারতবর্ষের পুণ্য তীর্থভূমি ভ্রমণ করিয়া যে "তপস্যার ফল" লাভ করিয়াছি, তাহা অন্যে ফকিরের সামান্য জিনিস মনে কবিলেও মণির সংস্পর্শে উহা যে অমূল্য হইবে এমনই আশা করিয়া তোমার করকমলে নির্ভয়ে বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ "তপস্যার ফল" উৎসর্গ করিলাম।

মহালয়া, ১৭ই আশ্বিন, ১৩২৫।
কুণ্ডা, দেওঘর, ই, আই, আর।

গ্রন্থকার।

তপস্যার ফল

হরসুন্দর জমিদার, বিদ্বান্। বিস্তর ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ ও বিশিষ্ট বংশমর্য্যাদা তাঁহার নামের স্কন্ধে আপনাদের গুরুভার চাপাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বজনবিদিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং দেশশুদ্ধ লোকের সুখদুঃখের অনেক সংবাদই কারণে অকারণে, অনেকসময় তাঁহার নিকট পৌঁছায়; কামানের গোলার মত কোনটা হরসুন্দরের সম্মুখে পড়িয়া তখনই তাহার প্রভাব বিস্তার করে, আর কোনটা বা পতনের ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী শব্দ করিয়া তখনই মিলাইয়া যায়।

অনেকে বাহির হইতে হরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের ঈর্ষা করে; অনেকে তাঁহার অপরিসীম সুখ-শান্তির অভূতপূর্ব্ব কল্পনা যে না করে, তাহাও নয়। কেহ কেহ নিজ নিজ দুর্ভাগ্যকে বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ ও উপদ্রব মনে করিয়া অকারণ চির অসন্তোষের নিকট দাসত্ব বরণ করিয়া লয়।

সে-দিন সন্ধ্যা হয় হয়। তখনও অস্তমিত সূর্য্যের অন্তিম অনুরাগ-ফাগে পশ্চিম গগন প্রান্ত অনুরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। হঠাৎ শীতের অবসানে কোথা হইতে একটা আনন্দ-আবেগ

কাহার অচির আগমনের বারতা বহন করিয়া তরুলতায় আকাশে বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সারাদিনের পর কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহল-পূর্ণ পথের উপর অকস্মাৎ গাড়ীর বন্যা নামিয়া আসিয়াছে। হরসুন্দরবাবুর অন্দরমহলের দ্বারেও 'মটর' গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। 'স্তাফার' বেচারী বোধ হয় বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তন্দ্রাতুর হইয়া ঢুলিতেছিল।

হরসুন্দর আপনার কক্ষের বাতায়নের নিকট বসিয়া দিনের শেষ আলোয় নিবিষ্টচিত্তে একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন। এমন সময় গৃহের মধ্যে সুরমা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরমা হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী। সুরমাকে দেখিবা মাত্র প্রথমেই আপন হইতে মনে আসে যেন তাহার অপূর্ব্বযৌবন তাহার নিকট বিদায় চাহিয়া 'নোটিস' দিয়াছে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে, মনে হয় তাহা নয়, বোধ হয় কোন গূঢ় চিন্তা তাহার যৌবন-বসন্তের উপর বর্ষার কালমেঘ ঘনাইয়া আনিতেছে।

সুরমা সুন্দরী। দেখিতে খুব সুশ্রী; বড়লোকের গৃহিণী ও বড়মানুষের কন্যা হইলে কি হয়? তাহার কোন রূপ অহঙ্কার নাই। সে দিন তখন বেশভূষা করিয়া সুরমা স্বামীর নিকট থিয়েটার দেখিতে যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিল। সুরমা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছেন। সুরমা একটু এদিক-সেদিক করিয়া, এটা-সেটা নাড়িয়া

স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইল, অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল ; "আজ কেমন আছ ?"

হরসুন্দর পুস্তকের উপর হইতে নয়ন না তুলিয়া বলিলেন, 'ভাল।' ইহাতে সুরমা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "আজ আর মাথা ধরে নাই ?"

হরসুন্দর এ প্রশ্নে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আসল কথাটা কি খুলে বল দেখি ?"

সুরমা স্বামীকে উত্তমরূপ চিনিত, সুতরাং আর অন্য কোন কথা না পাড়িয়া বলিল "যোগেশ বাবুর স্ত্রী সরলা দিদি আজ আমাকে থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।"

হরসুন্দর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন "বেশ যাও"।

অনেক সময় সুরমা ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া স্বামীর নিকট হইতে এমন স্নেহহীন ব্যবহার পাইত, যে পুনরায় কোন কথা প্রশ্ন করিতে সাহস করিত না। জিজ্ঞাসা করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা, সে বহুকষ্টে যে সহ্য না করিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহার অন্তরের গোপন বেদনা, অন্তরের মধ্যেই পথহারা পথিকের মত অনন্যোপায় হইয়া ঘুরিয়া মরিত। এ নিমিত্ত হরসুন্দর অনেক সময় সুরমাকে মেঘাবৃত চন্দ্রের মত মলিন ও বিষণ্ণ অবলোকন করিতেন। সুরমার বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার কোন কারণ কোনদিন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন,

এমন কথাও হরসুন্দরের মনে আসিত না। পরন্তু হরসুন্দরের চক্ষে সুরমার এই কর্ত্তব্য-মাত্রাবশিষ্ট অনুরাগহীন জীবনযাত্রা প্রাণহীন প্রেম-শূন্য নারীর অসম্ভব নিষ্ঠুর-মূর্ত্তিতে তাহাকে গড়িয়া তুলিত। সুতরাং সুরমার সহিত নিতান্ত যে কথা—না কহিলে চলে না তেমন কথাই বলিতেন। এদিকে সুরমা ভাবিত, আমি কথা কহিতে গেলে হয় ত তিনি বিরক্ত হন, অনেক সময় দুই একটী কথার অনিচ্ছায় উত্তর দেন। বোধ হয় বিষয়-কর্ম্মের কোনরূপ গোলযোগ হইয়াছে। এই প্রকার নারী-বুদ্ধি-সুলভ সহজ সরল মীমাংসার দ্বারা প্রথম প্রথম মনকে যত বেশী করিয়া প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইত, তত অধিক করিয়া সে যে স্বামীর নিকট হইতে আপনাকে তফাৎ করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিত না। মৌন হইয়া সকল আদেশ মানিয়া লইলেই বুঝি স্বামীর স্নেহ ভালবাসা পাওয়া যায়, হয়ত এমন একটী ভুল যুক্তি সময় সময় সুরমার নিরাশ্রয় মনকে আশ্রয় দান করিত। দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের অভিলষিত আস্বাদ না পাইয়া অনেক সময় হরসুন্দর ভাবিতেন তাঁহার জীবন ব্যর্থ! হরসুন্দর মনে করিতেন, যদি আমার ব্যবহার সুরমাকে কোনদিন ব্যথা দেয় তবে সে জন্য বিধাতাই দায়ী। যিনি অন্তর্যামী তিনিত জানেন, আমার অন্তর কাহার জন্য কি পরিমাণে ব্যাকুল! মনের অন্দরে যে প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ঈপ্সিতের আগমন প্রতীক্ষায় মন্দিরদ্বার চিরজীবন মুক্ত থাকিবে। অন্যের

স্থান স্বপ্নেও যে সেখানে হইতে পারে না, তাহাত অন্তর্যামী জানেন।

সুরমা চলিয়া যাইবার পর, তিনি পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্ত বাতায়নপথে অনন্ত বিস্তৃত সীমাহীন আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; সে দৃষ্টি যেন অসীমের পথে, একটা সীমারেখা টানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছিল। পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হইল প্রেম, ভালবাসা, এসব কবিকল্পনা, ইহাদের ভিতর বাস্তবের কোন চিহ্নই নাই। কল্পনা-সৃজিত অসম্ভব প্রেমের আস্বাদন করিতে গিয়া মানুষ ক্রমাগত নৈরাশ্যের তিক্ত ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া জীবনের সকল শান্তি অনায়াসে বিসর্জ্জন দেয়। সকলের আচরণের মধ্যেই একটা মিথ্যার কল্পনা আপন হইতে তাঁহার মনে উদয় হইত এবং সেই সকল চিন্তা মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া সময় সময় সকল মানুষের বিরুদ্ধে তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া যে না তুলিত এমন নয়। স্বার্থপর জগতের মানুষগুলার উপর রাগিয়া অনেক সময় তিনি আপনার নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা করিতেন।

সেইরূপ ভাবে অবস্থান করিবার জন্য প্রবাসে প্রবাসে প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এবং এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানর নিমিত্ত তিনি নিজ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, "মানুষের সমস্ত শরীরটার মধ্যে

মাথাটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে সত্য কিন্তু, মাথা ও পা এই উভয়ের মধ্যস্থানে বক্ষের অতি নিভৃত প্রদেশে হৃদয়ের যে পুণ্য-মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার সংবাদ বড় কেহ রাখে না। হায়! এ সংসারে মাথার জোরে সকল মিথ্যা সত্যের মুকুট পরিয়া নির্ব্বিবাদে অনায়াসে বিকাইয়া যাইতেছে!"

হরসুন্দর বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ারের উপর অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাহার নয়ন বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

২

যোগেশবাবু হাইকোর্টের একজন প্রতিভাবান উকিল। তাঁহার পিতা বহুদিন সবজজের আসন অলঙ্কৃত করিয়া আশাতিরিক্ত-অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ওকালতী না করিলেও বড় কিছু আসিয়া যাইত না। পায়ের উপর পা দিয়া সুখে তাঁহার জীবনের দিনগুলি যে অবলীলাক্রমে অতিবাহিত হইয়া যাইত, সে বিষয় কোন সন্দেহ ছিল না। এমন একটী অভাবহীন সংসারের স্নিগ্ধ ছায়ায়, সুখ, তাহার চঞ্চল আসনখানি অনুক্ষণ পাতিয়া আবেগ-বিহ্বল অন্তরের অলস দিনগুলিকে নাকে দড়ি দিয়া থিয়েটার, জু, বোটানিকেল গার্ডন প্রভৃতি স্থানে টানিয়া বেড়াইতে ছিল। গাড়ি ঘোড়া, টাকা, বিষয় সম্পত্তি, আনন্দ উল্লাস, নাচ গান ভিন্ন যে মানুষ সংসারে একদণ্ড টিকিতে পারে না, এমন একটী দৃঢ়সংস্কার এই সংসারের সকলের মনে ধীরে ধীরে বেশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতিদিন নিমন্ত্রণ-ব্যাপার লাগিয়াই আছে। যোগেশবাবুর স্ত্রী সরলা, এই সংসারের কর্ত্রী। তিনিও বড়মানুষের কন্যা। সুতরাং এই সংসারে সকল রকম আচার ব্যবহারের মধ্যে তাহার মনটী বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিল। যোগেশবাবু হরসুন্দরের সহাধ্যায়ী, এই সূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে খুব মেলা মেশা বিদ্যমান। পূর্ব্বে হরসুন্দর প্রায় এ বাটীতেই তাঁর

দিবসের অনেকখানি সময় পরমআনন্দে অতিবাহিত করিতেন। এখানেই অনেকদিন স্নান আহার হইত এমন কি কোন কোন দিন রাত্রিতে বাটী পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। সরলা হরসুন্দর বাবুকে খুব শ্রদ্ধা যত্ন, ও স্নেহ করিত। কারণ হরসুন্দরের মহৎ গুণ ছিল, তিনি যাহা সত্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহা তিনি এমন ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতেন, যে সহস্র যুক্তি তর্ক সেখানে অবনত মস্তকে হার মানিয়া ফিরিত। সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, এই সত্যকে যেখানে অসম্মানিত বা পদদলিত হইতে দেখিতেন, সেখানে ত একমুহূর্ত্ত অবস্থান করিতেন না, এবং সেই সকল সঙ্গ এক নিমিষে নির্ম্মম-ভাবে পরিত্যাগ করিবার মত অসাধারণ শক্তি ভগবান তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

হরসুন্দরের স্বভাবটী এদিকে যেমন বালকেরমত কোমল ও সরল ছিল তেমনই কোন একটা অন্যায় বা অসত্যের দিকে বজ্রবৎ কঠিন ছিল। তিনি একবার কোন একটী বিষয় ধরিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলে, কোন মতে অর্দ্ধপথে অশান্তির আশঙ্কায় ত্যাগ করা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। কুমীরের কামড়ের মত তিনি তাহা প্রাণপণশক্তিতে আঁকুড়িয়া ধরিতেন, হয় ত সে তর্কে তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত হার আসিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া না ধরিত ততক্ষণ কিছুতেই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কিন্তু হারিয়া কোন দিন

রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না বরং আনন্দিত হইতেন; বলিতেন "বৌ-ঠাকুরুণ! তুমিই বল এমন করিয়া যদি তর্ক না হ'তো তবে কি সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতো? এতবড় একটা লাভ কি আর সহজে হয়?"

এই পরিবারের সকলেই সেজন্য হরসুন্দরকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর তাঁহার আসা যাওয়াটা যেন অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একদিন ঝড়ের মত কোথা হতে এসে পড়েন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের সঙ্গে সত্যের কতখানি সম্বন্ধ এই প্রস্তাব তুলে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেন—তিনি বলেন "যোগেশদা উকিল হ'লে কি হবে, মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করাই হচ্ছে আজকাল ওঁর ব্যবসা; কি বল বৌ-ঠাকুরুণ? সেইজন্য উনি আজ কাল আমাদের তর্কে যোগ দিতে বড় নারাজ।"

যোগেশ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিতেন, "হরসুন্দর তোমার যুক্তি আমি কেমন করে মানি বল? সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই একবাক্যে বলেছে বিপন্নকে রক্ষা করার নাম হচ্ছে ধর্ম্ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে সত্য কথা বল্লে হয় ত তার মৃত্যু হবার সম্ভাবনা, তখন তোমার মতটী গ্রহণ কল্লে, বেচারীর সর্ব্বনাশ করা ভিন্ন আর কি করা হয় বলো?"

"যোগেশদা তুমি যাই বল, আর শাস্ত্রের যতই দোহাই দাও না কেন, মিথ্যা বলার মধ্যে এমন কোন জ্ঞান থাকতেই পারে

না, যেটা মনের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত স্পর্দ্ধা কোন দিন রাখতে পারে। যেটা অসত্য, সেটা কোন রকমে সত্যের অনাবিল দীপ্তি প্রকাশে অসমর্থ; কারণ সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ ; সে তার স্বাভাবিক শক্তি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে যে জাহির করবে, তার কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। রোগীর পিপাসা-কাতর জিহ্বায় দুধ দিয়া জল দিয়েছি বল্লে, তখনকার জন্য তার তৃষ্ণা কতকটা উপশম হ'তে পারে কিন্তু সে দুধ খেয়ে কোন দিন জল খেয়েছি এমন বিশ্বাস কিছুতে মনে আনতে পারবে না ; তাকে যে ঠকানো হ'য়েছে, এ কথা সে মুখ ফুটে না বল্লেও, মনে মনে যে বলবে, তাহা কেহ অস্বীকার কত্তে পারে না।"

সরলা বলিল, "ঠাকুর-পোর যুক্তি বেশ করে ভাবলে অমান্য করা যায় না। অর্থোপার্জ্জনের পন্থা যে, সব সময় ঠিক ন্যায়-ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তা নয় ; তবে নির্জ্জলা সত্যের আশ্রয়ে ব্যবসাও বোধ হয় ঠিক চলতে পারে না। কারণ পনরো আনা লোক যে পথে চলছে তার বিপরীত পথে গেলেই, সকলে পাগল বলে উড়িয়ে দেবে সে বিষয় সন্দেহ নাই।"

যোগেশ বাবু সরলার কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "আর এক আনা লোক না খেতে পেয়ে খুব শিগ্‌গির ভগবানের খাসমহলের শান্ত প্রজা হ'য়ে শান্তিলাভ করবে সেকথাটাও বল। পয়েণ্ট বাদ দিলে, প্রতিবাদী পক্ষ সহজে দাড়'বে কেন।"

হরসুন্দর বলিলেন, "যোগেশ-দা তা'হলেও "বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল", এ নজির অমান্য করা অসাধ্য। সবাই যদি নেশার ঝোঁকে, ছাদের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে প'ড়তে চায় —আর একজন যদি নেশা না করে তাঁদের বুঝিয়ে দেয় যে অমন কাজ করো না, এখনি হাত পা ভেঙ্গে চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে থাকবে, একথা খুব সত্য যে তার কথা তখন সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু আবার হাত-পা ভাঙ্গার অভিজ্ঞতাটা তারা যেমন হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে, সেটা কিন্তু কেউ দূরে থেকে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবে না।"

এই রকম তর্ক যখন খুব বেড়ে উঠত তখন সরলা আহারের আয়োজন করে এসে বলত "এখন অপ্রত্যক্ষকে ত্যাগ করে, প্রত্যক্ষ সত্য গ্রহণ করে এলে ভাল হয় না? ঘড়ির দিকে কি দেখা হ'য়েছে? রাত্রি বারটা যে বাজে!" তখন সকলের চমক ভাঙ্গিত ও আহারে বসিত।

আজ সরলা ঘড়ির দিকে চাহিয়া নিজে নিজে বলিয়া উঠিল "৭ টা যে বাজে, এখনও ত সুরমার দেখা নাই। ৭॥০ টার সময় প্লে আরম্ভ, একটু আগে গেলেই বেশ হ'তো"। তারপর রাস্তার দিকের জানালার ধারে গিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল সুরমাদের গাড়ী আসিতেছে কি না? কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া একখানি দোলনা কেদারার উপর হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল, কেদারাখানি সম্মুখ ও পশ্চাতে ক্রমান্বয়ে

চলিতে লাগিল। সরলার উদ্বিগ্ন চিন্তাটাও তাহার মনের মধ্যে ঐরূপভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সরলা ভাবিল, আজ হয়ত সাহস করে ঠাকুর-পোকে থিয়েটারে যাবার কথা বলতেই পারেনি, বেচারী ভয়ে ভয়ে নিজেকে যেন দিন দিন বড় তফাত করে ফেলচে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে একটা ভালবাসা আছে সেটার কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত এঁদের ভিতর দেখা যায় না, এ রকমটা ত কিছুতেই সহ্য করা যায় না। সুরমা যেন কোন দিক থেকে, সে যে তার স্বামীর উপযুক্ত এমন ভাবটা মনে আনতে শঙ্কিত হয়—জানি না, সে অভিমান করে এমন করে, না এটা তার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা? জোর করে আপনাকে প্রয়োজনের মধ্যে টেনে আনা, আপনার অধিকার প্রমাণ করে দখল করা কোন স্ত্রীলোকেই কোন দিন সহ্য করতে পারে না, তবে সুরমাই বা কেমন করে এই অনাদর ও উপেক্ষাকে অনায়াসে ঠেলে ফেলে তার নারীজন্মকে সার্থক করতে পারে? ঠাকুর-পো তার সঙ্গে একদিনও হেসে কথা কয় না, প্রকাশ্যে মুখ ফুটে কোন দিন উপেক্ষার ভাব না দেখালেও, তার অন্তরের অপ্রয়োজনের ভাবটী [illegible]র বিষণ্ণকাতরদৃষ্টিই যেন সুরমাকে সে সংবাদটা দিতে কিছুমা[illegible] অনুভব করে নাই। সরলা অবশ্য জানিত, এ বিবাহে হরসুন্দরের মত ছিল না, কেবল হরসুন্দরের পিতা [illegible]দের বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্য করিয়া ফেলেন। সরলা এ বিষয় [illegible]নইয়া হরসুন্দরের সঙ্গে অনেক তর্ক করিয়াছে কিন্তু তাহাকে

তর্কে কোন রকমে হটাইতে পারে নাই। সুরমার দুঃখে আজ তাহার অন্তর উত্তপ্ত ও ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল—সুরমা তার বেদনা-পীড়িত, বিষন্নকাতরহৃদয় খানি ঢাকিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, সরলার সহানুভূতি-কাতর নারী-হৃদয়ের কাছে পদে পদে তাহা অবিচারে ধরা পড়িত এবং সুরমার অবাধ্য নয়নাশ্রু তাহার নির্ম্মমভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিত। সেজন্য সরলা প্রায়ই তার নিঃসঙ্গ সময়টাকে আপনাদের সঙ্গদানে সুখী করিতে প্রয়াস পাইত। সম্মুখের আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িয়া যোগেশ বাবু একখানি বই পড়িতেছিলেন, সহসা পাঠে-সংবদ্ধ-চক্ষু পুস্তক হইতে তুলিয়া বলিলেন "এই যে সুরমা এসেছে। কিন্তু বড় দেরি করে ফেল্লে। এতক্ষণ বোধ হয় হরসুন্দরের নিকট হ'তে ছুটীর দরখাস্ত পাশ হয় নি?"

একথায় সুরমা মুখখানি দুঃখের অব্যক্তভারে অবনত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "তাঁর ত চিরদিন ছুটী দেওয়াই আছে, তবে আমাকে এক এক বার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।" এই কথাগুলি বোধ হয় সুরমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করিয়া রক্তরঞ্জিত হইয়া বাহিরে আসিল। সরলা তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে এমন একটী অনুযোগ-দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল, যে যোগেশবাবু ত সেকথা উত্থাপন করিতে সাহস পাইলেন না এবং মনে ম। অত্যন্ত অনুতপ্ত ও যথেষ্ট লজ্জিত হইলেন। সরলা সুরমার হাত অত্যন্ত প্রীতিভরে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বলিল, "আর দেরি কল্লে জায়গা পাওয়া যাবে না।"

৩

প্রাতঃভ্রমণান্তে রমেশবাবু যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন শীত-শয্যা ত্যাগ করিয়া খুব অল্পসংখ্যক লোকমাত্র পথে বহির্গত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে যাঁহারা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, সুখ-দুঃখ সমান মনে করেন, এতভোরে সেই সকল কুললক্ষ্মীগণই কেবল গঙ্গাস্নানান্তে হিম ও কুয়াসার অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ধীর পাদ বিক্ষেপে গৃহে ফিরিতেছিলেন। রন্ধনশালা-নির্গত ধূমরাশি উর্দ্ধে পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কুয়াসাভারাক্রান্ত হিমসিক্ত বায়ুস্তরে তাল পাকাইয়া জমিতেছিল। মাথার টুপি ও 'কমফর্টার', পায়ে মোজা, অলষ্টারে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রমেশবাবু শীতের বায়ুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সগর্ব্বে চলিতেছিলেন। রমেশ, জমিদার-বন্ধু হরসুন্দরবাবুর বাড়ীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে দ্বারবানকে আধাবাঙ্গলা ও আধাহিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন "বড়বাবু উঠা হায় কিনা ?"

দ্বারবান রমেশবাবুকে চিনিত সুতরাং যথারীতি অভিবাদন করিয়া উত্তর করিল "বাবুতো বহুৎ দেরসে বাহারমে বৈঠা হায়।"

রমেশবাবু মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এখনও ছয়টা বাজে নাই, এরিমধ্যে বড়লোকের নিদ্রা কেমন করিয়া ভাঙ্গিতে পারে? আর যদিই বা কোন কারণে উঠিয়া থাকেন, তবে কেমন করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া একাকী বাহিরে আসিয়া

বসিতে পারেন ? বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া রমেশবাবু দেখি-লেন, হরসুন্দরবাবু টেবিলে দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া গভীর চিন্তানিমগ্ন। হরসুন্দরবাবু বন্ধুর গৃহপ্রবেশ মোটেই জানিতে পারিলেন না। রমেশবাবু মনে করিলেন, বোধ হয় শরীরটা ভাল নাই; সেকারণ অমন ভাবে বসিয়া আছেন। বলিলেন "কিহে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে মনস্থ করেছ বুঝি ?"

হরসুন্দর চমকিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলেন, 'ধড়াচুড়া' আঁটা বন্ধু রমেশ! তিনি বলিলেন, "তুমি যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একজন বড়দরের বীর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যে সম্পূর্ণ আয়োজন করে বেরিয়েছ দেখ্‌চি।"

রমেশবাবু বলিলেন "যুদ্ধ করতে হ'লে যে, আয়োজন করতে হয় তার আর বিচিত্র কি ? যারা আয়োজন না ক'রে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তারা যে কেবল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তা নয়, নির্ব্বুদ্ধিতারও যথেষ্ট পরিচয় দেয়।"

হরসুন্দর বলিলেন "সেই জন্য বুঝি য়ুরোপীয়গণ আপনাদের পদে যতদিন সম্পূর্ণ নির্ভর করে দাঁড়াতে না পারেন, সংসারযুদ্ধে তত দিন অগ্রসর হন না ?"

রমেশ কহিলেন "আর এদেশের লোক ঠিক তার বিপরীত কারণে যুদ্ধে নিযুক্ত হয় ব'লেই দিবারাত্রি পরাজয় ও অভাবের অপমানে নিপীড়িত হচ্ছে না কি ?"

হরসুন্দর বলিলেন "এক দিক থেকে কথাটা ঠিক।"

রমেশ বলিলেন, "শুধু এক দিক থেকে নয়, সুন্দর! সবদিক হতেই খুব ঠিক বোলে আমার মনে হয়। দু'চার জন বড়লোকের কথা অবশ্য ভিন্ন।" রমেশ অনেক সময় হরসুন্দরকে আদর করিয়া "সুন্দর" বলিয়া ডাকিতেন।

হরসুন্দর যেন বন্ধুর উপর একটুখানি অভিমান-ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রমেশ এখানে প্রকাণ্ড একটা ভুল করে বসলে, বড়লোকগুলাও তোমাদের মত হাত-পা বিশিষ্ট মানুষ বৈ ত আর কিছু নয়, ভাই! সুখদুঃখ বোঝবার মত শক্তি ভগবান তাহাদের দেন নাই একথা বলা অন্যায় হয়।" রমেশ বুঝিলেন একথাটা বন্ধু-হৃদয়ে একটু আঘাত দিয়াছে, সে জন্য ব্যথিত হইয়া বলিলেন, আমিত এমন কথা বলি নাই যে, তাহাদের সুখ দুঃখ অনুভব করবার মত শক্তি নাই—সে শক্তির অনুশীলন না থাকা সম্ভবপর হতে পারে, কেন না, সাংসারিক কোন প্রকার অভাব তাঁদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্থান পায় না, একথা মানত?"

এবার হরসুন্দর মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি কি বলতে চাও যে, অর্থের অভাবই মানুষের সব চেয়ে বড় অভাব! পেটের জ্বালাই কি মানুষের সব চেয়ে বড় জ্বালা!—না রমেশ, তা নয়, মানুষের বাহিরের অভাব অপেক্ষা অন্তরের অভাব অনেক বেশি। পেটের চেয়ে প্রাণের ক্ষুধা কতখানি, তা কেমন করে তোমায় বোঝাব বল?" বলিয়া হরসুন্দর একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রমেশবাবু দেখিলেন হরসুন্দরের মুখের উপর একটা অপ্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন "একথা অবশ্য তুমি বলতে পার, যে প্রাণের অভাব সব চেয়ে বড় অভাব, কিন্তু কয়জন সে দিকে লক্ষ্য করে ভাই! আমাদের জন্ম যেন মনে হয় শুধু মৃত্যুর জন্য। সত্যি সত্যি বাঁচবার জন্য কয়জন আমরা বেঁচে আছি বল?"

হরসুন্দর বলিলেন, "সেই কথাই আমি বলছিলাম; কি নিয়ে মানুষ থাকতে পারে বল? কেবল বড়মানুষ ব'লে, সাধারণে আমাদের সম্বন্ধে অনেক সময় অবিচার করে বসেন। আমার মনে হয় তোমরা যতটা নিজেদের সকলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পার—আমরা সব সময় না হ'লেও অনেক সময় মিশতে ইচ্ছা করেও তা থেকে বঞ্চিত হই। তার কারণ, আমরা বড়মানুষ—একপ্রকার জীব! সাধারণের সঙ্গে মিশবার মত বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয় আমাদের নাই। এই যে একটা প্রকাণ্ড অসত্য কেমন ক'রে, গর্ব্বভরে সমাজের মধ্যে নির্ব্বিবাদে চলে বেড়াচ্ছে, তা মনে হলে, অনেক সময় দুঃখ হয়, নির্ব্বাক্ হ'য়ে যেতে হয়?"

রমেশ বলিলেন "এক জনের কথা অবলম্বন ক'রে কোন একটা সমাজ বা সম্প্রদায়ের কথা বলা অন্যায় হ'তে পারে—কিন্তু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আদর্শ করেই সমাজ চিরদিনই গঠিত হয়। তোমার কথা স্বতন্ত্র, তোমার অন্তর জানি বলেই, আজও

তোমার 'দরজায়' আসি—যারা তোমায় বুঝতে পারে না—তারা, সকল বড়লোকের সম্বন্ধে যেমন ভাবে, তোমার সম্বন্ধেও ঠিক তাই ভাবে।"

এই সময় বেহারা আসিয়া টেবিলের উপর একখানি সংবাদপত্র রাখিয়া গেল। রমেশ অন্যমনস্কভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতেছেন দেখিয়া হরসুন্দর বলিলেন, "খুব সত্যি কথা বলচি রমেশ, এর মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জিত মনে ক'রো না। বাহিরের দিকটা মানুষের 'সাজা' দিক। ঐদিকটাই হচ্চে তার দোকানদারীর দিক—অভিনয়ের দিক। সেদিক থেকে বাস্তবের সন্ধান করা বড় সোজা কথা নয়। মানুষের ভিতর দিকটাই হচ্চে তার আসল দিক, সেদিকটাই কিন্তু বহুমূল্য রত্নের মত লুকিয়ে রাখাই হচ্চে মানুষের স্বভাব। দুটাদিকের মধ্যে এত অসামঞ্জস্য যে একত্র করে দেখ্‌তে গেলে, আশ্চর্য্য হ'তে হয়।"

রমেশ বলিলেন "সব মানুষই কি তাই? অনেকের যে ভিতর বাহির এক।" হরসুন্দর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যদি তেমন মানুষ থাকে তবে হয় ত এত কম, যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না। দেখ রমেশ, আজকাল কিছুতেই কোনখানে একরতিও শান্তি পাই না। সকলের পরিচয় ও আচরণের মধ্যে একটুখানি প্রাণের সম্পর্ক দেখতে পাই না। উপর উপর আলাপ, ভাসা ভাসা আত্মীয়তা, মিথ্যা প্রণয়—এ সকলের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধির খুব একটা মাজাঘষা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য।"

রমেশ একটু সিধা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "কথাটা সত্য হ'লেও, দোষ কোন্‌খানে তার বিচার করা কি উচিত নয়? বড়লোকেরাই ভাল ও মুক্তহস্ত, আর দেশশুদ্ধ লোক মন্দ! তাঁহারা সকলেই এক একটা মতলব নিয়ে মিশতে চান, একথা কোনও যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়! খাঁটি সত্যি কথা যারা বলতে আসে, তারাই কিন্তু তোমাদের কাছে বেশী আঘাত পেয়ে ফিরে যায়। সেই সত্যের অবমাননার পাপেই দিনরাত আঘাত খেতে খেতে তোমরাও যে সংসারে এতটুকু শান্তি পাও না, তা জানি, কিন্তু তা ব'লে সকল মানুষকে সেই এক অভিযোগে অভিযুক্ত করতে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়।"

হরসুন্দর শূন্যদৃষ্টিতে হাসিয়া উঠিলেন। রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে অমন ক'রে হাসলে?"

হরসুন্দর বলিলেন, "এই দেখনা, যদি একটু হেসেছি, আর তুমি একেবারে চম্‌কে উঠেছ। কিন্তু তুমি হাসলে ত অতখানি আশ্চর্য্য হবার কোন প্রয়োজন আমি মোটেই মনে করি না। আমি অপরের কথা ত্যাগ ক'রে নিতান্ত ঘরের কথা —আপনার জন যাদের বলা যায়, তাদের কথাই উল্লেখ করে বলচি, কই তারাও ত আমাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। সংসার কেবল আঘাত দিয়েই বড় হবার অধিকার চায়—কিন্তু বুক পেতে আঘাত নেওয়ার মধ্যে যে সত্যিকার বড় হবার সকল

শক্তি সঞ্চিত হ'য়ে আছে, সংসার মোটেই সেটা স্বীকার করতে রাজি নয়।"

এবার রমেশ তর্কের মাত্রা কমাইয়া আনিলেন। বন্ধুহৃদয়ের কোন্‌খানে ব্যথা, সে বেদনা যে কতখানি, তাহা রমেশ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও, বন্ধুবৎসল অন্তর দিয়া অনেকখানি যে না বুঝিলেন, তাহা বলা যায় না।

এই সময় রামদিন খানসামা একখানি বড় ট্রের উপর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ট্রেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া যথারীতি চা প্রস্তুত করিবার উপক্রম করিলে, হরসুন্দর সহসা সে দিকে ফিরিয়া বলিলেন "রামদিন, এখন যাও, দরকার হ'লে ডাকব এখন।"

রামদিন অল্প আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল। খাওয়া দাওয়া লইয়া এমন ব্যাপার যে মাঝে মাঝে না ঘটিত তাহা নয়। অনেকদিন যেমন অবস্থায় সে ট্রে রাখিয়া গিয়াছে, ঠিক তেমন অবস্থাতেই পরে ফেরৎ লইয়া গিয়াছে। তবে কোন দিন বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে এমনটা ঘটে নাই। বেচারী বাহিরে আসিয়া মনে মনে বলিল "বড়লোকের মনের কথা কে জানে বাবা!" রামদিনের একটু দুঃখ হইল। তারপর সে পকেট হইতে "বিঁড়ী" বাহির করিয়া বারান্দায় বসিয়া নির্ব্বিবাদে আপন মনে টানিতে লাগিল। সুদূর চট্টগ্রামের মধ্যস্থিত কোন একটি পল্লী-গ্রামের অতিক্ষুদ্রপর্ণকুটিরের চিত্র, পৃথিবীর সকল সম্পদ ও সৌন্দর্য্য

মাখিয়া প্রবাসী রামদিনের মনের মধ্যে সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কখন যে বিঁড়ী নিবিয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সে ক্রমান্বয়ে অধরস্থিত অগ্নিহীন বিঁড়ী টানিতেছিল আর অপূর্ব্ব আনন্দের কল্পনালোকে দেখিতেছিল, প্রভাতের কনকোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণটি—এমনই করিয়া তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে উঠানের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর তার ছোট ছেলেটি এতদিনে হয়ত হাঁটিতে যাইয়া কতবার সেই উঠানে পড়িয়া গিয়া উল্লাসে হাসিয়া উঠিতেছে। আর একজন দাওয়ার উপর বসিয়া নির্নিমেষ-নয়নে এই ক্ষুদ্র শিশুটির পতন-উত্থান দেখিয়া অঞ্চলে আনন্দাশ্রু মুছিতেছে। রামদিনের নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

হরসুন্দর বলিলেন "ভাই রমেশ! এইমাত্র তোমাকে যে কথা বল্‌ছিলাম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে ত? আমাদের মত হতভাগ্য বড়লোকের জীবনটা কতকগুলি নিয়মের মধ্য দিয়া অসাড় ভাবেই পরিচালিত সুতরাং বড়লোকের সংসারের মধ্যে এতটুকুও প্রাণের লক্ষণ বা স্নেহের ক্ষীণছায়া পরিদৃষ্ট হয় না। না খাইলে, কেহ ত এতটুকু অনুরোধও করে না। কেন করে না, জানি না। যদি বা কেহ কোন দিন, একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহাও যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও মুখস্থ তাহা বুঝিতে তিল মাত্র বিলম্ব হয় না।" বলিয়া হরসুন্দর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে হইল যেন গৃহের সমস্ত বাতাস সে নিঃশ্বাসে

স্পন্দিত হইয়া উঠিল। রমেশ নির্ব্বাক হইয়া হরসুন্দরের মুখের দিকে বেদনাকাতরনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বন্ধুবৎসলতার করুণ সমবেদনায় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যেন তাঁহার সমস্ত মন নিঃশব্দে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বক্ষপঞ্জরের মধ্যে লুণ্ঠিত হইতেছিল।

উভয়েই অল্পক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। হরসুন্দর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রমেশ, চা খাও ভাই! তোমার চা খাবার সময় হ'য়েছে বোধ হয়?" রমেশ উত্তর করিলেন "না, এখনও ঠিক চা খাবার সময় হয় নি। কেন না, আমি বাড়ী ফিরলে তবে গিন্নী জল বসাবেন। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন। আজ আমার একটু বিলম্ব হয়েছে। এতক্ষণ তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, হয় ত বা কাহাকেও রাস্তায় অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছেন---এমন বাতিক কিন্তু কখন দেখি নাই।"

হরসুন্দর, বন্ধু সুখী ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। অল্পক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিলেন, "তবে তুমি যাও ভাই! তাঁ'কে আর অনর্থক ভাবিও না। বাড়ী গিয়া চা খাবে, কেমন?"

রমেশ বলিলেন, "সেজন্য কিছু আসে যায় না; না হয়, আজ এখানেই খেলাম—যেখানে হোক চা খাওয়া নিয়ে বিষয়।",

তপস্যার ফল

১

হরসুন্দর কথাটা অত সহজ ও সামান্য মনে করিতে কষ্ট অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, শুধুই কি যেখানে হোক চা খাওয়া আর গৃহে—যেখানে একজন তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া আগ্রহভরে আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার সঙ্গে সমান! মনে মনে বলিলেন, কখনই নয়, কিছুতেই নয়, কোন দিনই নয়! তাঁহার আরও মনে হইল, রমেশ! বন্ধু! তুমি কেমন ক'রে এত সহজে তুইটাকে এক করিলে ভাই? তারপর রমেশের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, সে তুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিতেছে। বন্ধুসংসর্গে হরসুন্দরের মন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়াছিল।

রমেশ বলিলেন, "সুন্দর! এস, চা খাওয়া যাক" হরসুন্দর বিনা আপত্তিতে—বন্ধুহস্ত হইতে আগ্রহভরে চায়ের পেয়ালাটী গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন।

চা-পান শেষ করিয়া হরসুন্দর বলিলেন "বাইশ বৎসর বয়সের সময় আমার রাহুর দশা সুরু হইয়াছে, এবং রাহুরদশায় যাহা যাহা হওয়া প্রয়োজন তাহা আমার অদৃষ্টে প্রতিদিন প্রতি-নিয়ত ঘটছে। আমার গৃহ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব থাকিতেও আমি গৃহহীন, আত্মীয়হীন, বান্ধববিহীনের মত দেশেদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই ঘুরে বেড়িয়ে আমি সুখী। ব্যর্থজীবনে যত টুকু সুখ হ'তে পারে বা হওয়া সম্ভবপর তা বোধ হয় এই রকম-ক'রেই হয়।

রমেশ বলিলেন, "এর অর্থ কি ?"

হরসুন্দর কহিলেন, "তা জানি না রমেশ, তবে এই পর্য্যন্ত জানি ভাই! যত দূরে যাই, যত বাহিরে থাকি, ততই যেন আমার মনে হয় আমি খুব সুখে আছি। শান্তিতে আছি। তুমি ভাই কিছু মনে ক'রো না। এখানে সংসারের মধ্যে এতটুকু প্রাণের পরিচয় নাই। কেবল মিথ্যার হীন অভিনয়। কেবল আধুনিক সভ্যতা ও মিথ্যার নামে ভদ্রতার ভান। কেউ কারো খোঁজ নেয় না, যে টুকু করে—থাক্! তোমাদের সুখের পথে আর কেন অশান্তির আগুণ জ্বালি। বড় দুঃখ আমি কেন সকলকে আপন ক'রে নিতে পারি নাই? কেন সবাই আমাকে তাদের নিজের জন জেনেও আমার সম্মুখে অমন স্নেহমমতার নির্লজ্জ অভিনয় করে। তাদের সকল প্রয়াস, সকল সতর্কতা, সকল কৌশল, নৈপুণ্যবিহীন চিত্রকরের অক্ষম অনুকরণ-প্রয়াসী তুলিকার হাস্যকর বিরাট ব্যর্থতার কথাই মনের মধ্যে বারম্বার জাগিয়ে তোলে" বলিয়া হরসুন্দর দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া অবাধ্য অশ্রুর গতিরোধ করিলেন।

রমেশ বলিলেন "আমি দেখছি তোমার মনের মধ্যে অসম্ভব অশান্তি এসেছে। অনেক তর্ক করা গেছে, এখন একটা কথা বলি, আজ বিকালে তুমি আমাদের ওখানে খাবে। কেমন?"

হরসুন্দর বলিলেন "আচ্ছা কিন্তু আমি রাত্রি দশটার গাড়ীতে আজ বাহিরে যাব, তার আগে যেন হয়।" ঐ দেখ-

আমার যাবার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত।” রমেশ দেখিলেন, বৈঠক-খানাঘরে বিস্তর লগেজ বাঁধা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন “আচ্ছা তাই হবে। এখন আসি” বলিয়া পুনরায় বলিলেন “সন্ধ্যার সময় আস্‌তে চেষ্টা ক’রো, অনেকদিন একসঙ্গে বসে গল্প করা হয় নি।” রমেশ পথ চলিতে চলিতে, ভাবিতেছিলেন, ললিতা যদি আজ সুন্দরের গৃহিণী হ’তো তবে সে কত সুখী হ’তো!

৪

বেলা প্রায় বারটার সময় হরসুন্দর যোগেশবাবু এটর্ণির আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যোগেশবাবু মক্কেলের সহিত এ মোকর্দ্দমা যে জিত না হইয়া যায় না, তাহার যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনে অত্যন্ত ব্যস্ত। মক্কেলটী এই আশান্বিত জয়ের উল্লাস সম্পূর্ণ চাপিয়া রাখিতে না পারায়, তাঁহার অধর প্রান্তে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত মৃদু মধুর হাসি দেখা যাইতেছিল। সুচতুর এটর্ণি মক্কেলের দুর্ব্বলতা তাহার অজ্ঞাতে যে দেখিয়া লইতেছিলেন, তাহা সে কোন মতে বুঝিতে পারিতেছিল না। এই হাসির মাত্রার উপর যে এটর্ণি মহাপ্রভুর খড়্গা উত্তোলিত হইবে, হতভাগ্য মক্কেলটী সে দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া, প্রতিপক্ষের পরাজয়-বিষন্ন-নতদৃষ্টি ও অপমানভারাক্রান্ত অন্তরের কল্পনায় যে সুখের সুবর্ণ-পিঞ্জর বুনিতেছিল তাহা যে গুটীপোকার মত তাহাকেই বেষ্টন করিয়া অচিরে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে এমন ধারণা, তাহার মনে আসা তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষসংবদ্ধ আসন্নশিকার ব্যাঘ্রের সম্মুখে হঠাৎ কোনরূপ অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলে, সে যেমন মৃত্তিকার উপর কেবল লাঙ্গুল আছড়াইতে থাকে, এ ক্ষেত্রে অকস্মাৎ আজ হরসুন্দরকে আপিসে দেখিয়া যোগেশ মনে মনে, উপস্থিত

শিকার ফস্‌কাইবার আশঙ্কায় কতকটা অভ্যাস বশতঃ লোভের লাঙ্গুল যে না আছড়াইয়া ছিল, এমন কথা বলা যায় না।

হরসুন্দর খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ যোগেশ-দা? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, সেজন্য তোমার ওখানে যেতে যেতে পথে মনে পড়ে গেল, যোগেশ-দা ত আর আমার মত বেকার নয় যে যখন ইচ্ছে গেলেই দেখা হবে! তাই একেবারে তোমার আপিসে এসে হাজির··· বড়ব্যস্ত কি? না হয় একটু বসি।"

যোগেশবাবু বহুদিন পরে বাল্যবন্ধু হরসুন্দরের এই অপ্রত্যাশিত আগমনটার যে কোন একটা বিশেষ কারণ আছে, এক মুহূর্ত্তের ভিতর মনে মনে ঠিক করিয়া লইলেন, বলিলেন "না তেমন জরুরী কিছু নেই। থাকলেও—পড়ে থাকবে, কতদিন পরে আজ তোমার সঙ্গে দেখা, কাজ ত ভাই রোজই আছে, এস আমার ঘরে এস, বলিয়া হরসুন্দরের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে একবার বক্রদৃষ্টিতে মক্কেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "তা'হলে আজ আপনি আসুন—আর কিছু টাকা খরচার জন্য দিয়ে যাবেন, অনেক টাকার বিল হয়েছে বোধ হয় দেখে থাকবেন?"

পাশের ঘর বলিতে, ক্যাম্বিশের বেড়া দেওয়া চার হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ একটী খাঁচা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটী টেবিল, দুইখানি চেয়ার, একটি 'বুককেস' আর

টেবিলের উপর পুলিশের লাল পাগড়ীর মত কতকগুলি লাল রংয়ের ফিতা বাঁধা কাগজের তাড়া। হরসুন্দরকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া যোগেশবাবু একখানি চেয়ারে নিজে বসিলেন, বলিলেন "তারপর বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌চে; তুমি যে বই ছেড়ে, ঘর ছেড়ে কোনদিন এতদূর আসতে পার, সত্যি বলতে কি এটা আমার খুব নূতন বলে মনে হচ্ছে। যাক্, তুমি কেমন আছ ভাই? এখন আমাদের বাড়ী আসা ত এক রকম ছেড়েই দিয়েছ; এজন্য তোমার বৌদিদি কত দুঃখ করেন। মা, সেদিন কাশী থেকে লিখেছেন, হরসুন্দর আজ কাল আসে কিনা? সে কেমন আছে?" হরসুন্দর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যোগেশ-দা, বই ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, যে কতদূর যেতে পারি, তারই একটী ব্যবস্থা করতে তোমার কাছে আজ এসেছি। বৌদিদিকে আমার নমস্কার দিও। মাকে লিখ, তাঁর আশীর্ব্বাদে এখনও বেঁচে আছি।"

যোগেশ হরসুন্দরের উত্তরে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে একবার ভাল করিয়া বন্ধুর মুখখানি দেখিয়া লইলেন; দেখিলেন, সে মুখের উপর কোনরূপ আকস্মিক উত্তেজনার লক্ষণ বা কোন প্রকার বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই। বরং খুব একটা স্বাভাবিক দৃঢ়তার সংকল্প যেন ফুটিয়া রহিয়াছে।

যোগেশ বলিলেন "সে আবার কি মতলব করেছ—আচ্ছা একটা কথা বলছিলাম—"

হরসুন্দর তাড়াতাড়ি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "যোগেশ-দা অভদ্রতা মাপ কর, কিন্তু তোমার কথা শুন্‌বার আগে, আমার কথা গুলো তোমাকে ভালকরে শুনে নিতে হবে. আমার বেশী সময় নেই, আজিই রাত্রির গাড়ীতে আমাকে যেতে হবে। তুমি নিশ্চয় আমার উপর খুব রাগ কচ্ছ, সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু, যোগেশ-দা, আমার কোন উপায় নাই।" যোগেশবাবু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত হরসুন্দরের কথাগুলি শুনিতেছিলেন, যখন জানিলেন তাহাকে আজিই রাত্রির গাড়িতে যেতে হবে, তখন তিনি সব কথা চাপা দিয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে সহাধ্যায়ীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি?"

হরসুন্দর সে স্পর্শে, বহুদিন পরে অতীত ছাত্র-জীবনের একটী অকৃত্রিম বান্ধবতার নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলেন। বলিলেন "যোগেশ-দা, তোমার কাছে আমি কোন দিন কিছু লুকাই নি বা গোপন করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ, তা তুমি ভাল জান। আমি একটা উইল করতে চাই, সেইটে ভাই তুমি করলে আমার একটা তৃপ্তি হবে। আজই তার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।"

যোগেশবাবু বলিলেন "এত তাড়াতাড়ি নাই বা এ কাজ করলে, এর পর দেখে শুনে, একটা কল্লেই হবে? তোমার বৌ-দিদির ঠেঙ্গে এ বিষয়ে একটা যুক্তি নিলে হয় না?"

"যোগেশ-দা তোমায় ত আগেই বলেছি—আর তর্ক করবার সময় নেই। বৌ-দিদিকে এ বিষয় বুঝিয়ে রাজি করবার মত আমার সাহস নাই" বলিয়া কি রকম উইল হইবে তাহারি একটা মোটা-মুটি খসড়া যাহা তিনি নিজেই করিয়া আনিয়াছিলেন, সেখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া যোগেশ বাবুর হাতে দিলেন।

যোগেশবাবু অনন্যোপায় অবস্থায় সেখানি আগাগোড়া খুব ভাল করিয়া পড়িলেন, বলিলেন "সুরমাকে তুমি যা দিয়েছ, এ তার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু সে কি এর জন্য—" হরসুন্দর তাড়া-তাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন "যোগেশ-দা—এখন আমি যাই, বিকালের দিকে এসে সই করব।" যোগেশবাবু বলিলেন "একটা কথা, ললিতা যদি তোমার এই দান গ্রহণ করা অন্যায় মনে করে—তাই ভাবচি।" হরসুন্দর সেকথার কোন উত্তর না দিয়া কক্ষ হইতে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যোগেশবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে নিজের ঘরে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বৈকালে আসিয়া হরসুন্দর উইল রেজেষ্টারি করিয়া গেলেন।

৫

সে দিন সন্ধ্যার অল্প পরেই হরসুন্দর রমেশের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। রমেশ, বন্ধুকে মহানন্দে আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া হাজির করিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী, ঘরগুলি তেমন বড় ও বহু আসবাব পত্রে সুশোভিত নয়। বৈদেশিক চিত্রকলা-বিশারদ শিল্পীর অঙ্কিত বহুমূল্যচিত্রে গৃহভিত্তি অলঙ্কৃত নয়। ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান সুদৃশ্য কার্পেটিও বিস্তৃত নাই সত্য, কিন্তু মেঝেটি এত সুন্দর করিয়া পরিষ্কার করা, যে দেখিবা মাত্র মনে হয় সমস্ত মেঝেটি যেন কাহার করুণামণ্ডিত শ্রমনিপুণ হস্তের সহিত নিত্য-সৌহৃদ্যে চিরাবদ্ধ। হরসুন্দর অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে ঘরের প্রত্যেক জিনিসটি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, প্রত্যেক দ্রব্যটি যেন গৃহস্বামিনীর ঐকান্তিক যত্নলাভে উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। মূল্যবান দেরাজটি হইতে সামান্য মূল্যের একটি ভাঙ্গা টিনের পেটরাও ঠিক সমান সমাদর লাভ করিয়াছে। কোনখানে একটী জিনিসও বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া নাই। গৃহমধ্যস্থিত জিনিসগুলি যেন তাহাদের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার মধ্য হইতে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয়তাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ

করিতেছে। রমেশের সংসারটি যে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা, যে কেহ, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে। কয়েকখানি চিত্রও যে নাই, তাহা নয়। চিত্রগুলি দেবদেবীর লীলাসংক্রান্ত। কোনখানিতে বিশ্বেশ্বর ভিখারী সাজিয়া অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা করিতেছেন, কোনখানিতে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিবার জন্য লক্ষণকে নির্ম্মম আদেশ প্রদান করিতেছেন, কোনখানিতে বা মানিনী রাধা দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিয়াছেন—রাধাবিরহ-বিহ্বল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কোমল চরণ দুইখানি একান্তমনে অনুরাগভরে ধরিয়া মানভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। আরো অন্যান্য অনেক চিত্র আছে। সেগুলি দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিবার অনেক খোরাক পাওয়া যায়।

হরসুন্দর ঘরটির মধ্যে বসিয়া একটি অনাবিল আনন্দের মধুর ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অনেক দিন এমন একটা পরিতৃপ্তি পান নাই।

এই সময় ঘরের মেঝের উপর দুইখানি আসন পড়িল। রমেশবাবুর স্ত্রী অল্প অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহের মধ্যে স্বয়ং আসিয়া স্বহস্তে আসনের সম্মুখের স্থানটি পরম প্রীতি সহকারে মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। রমেশবাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটু পরে খাবার দিও, হরসুন্দর বল্‌ছে, গাড়ীর এখনো দেরী আছে।" হরসুন্দরের মনের মধ্যে মানুষের হৃদয়হীনতার জন্য যে

একটা তীব্র অশান্তি ও বিরক্তির ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবটি হঠাৎ যেন রমেশবাবুর স্ত্রীর অবিচ্ছিন্ন প্রীতি ও পবিত্রতার মধ্যে ক্ষণকালের জন্য দিশেহারা হইল। হরসুন্দর মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার ব্যর্থজীবনের মধ্যে একটা আশার অরুণালোক দর্শন করিয়া নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা বেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছিলেন না। নিরাশা ও সন্দেহের নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের কত দীর্ঘ দিবসযামিনী কেবলই চিরব্যর্থতার বিরাট্ আয়োজন করিয়াছে। কোনখানে যে অন্তরে এতটুকু মিল আছে বা থাকিতে পারে অথবা কোন খানে কোন দিন কেহ নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিবার মত উন্নত প্রাণ লইয়া ঘর করে, এমন একটী ধারণা, তাঁহার নিকট কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত না।

হরসুন্দর অন্দরের শয়নকক্ষের মধ্যে বসিতে প্রথমে একটুখানি সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন। বাহিরের বৈঠকখানায় বসাই যেন তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল, এমন কথাও তিনি যে মনে করেন নাই, তাহাও নয়। কিন্তু রমেশ যখন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে বলিতে বলিতে আসিলেন "ওগো! বড় বেশী বিলম্ব কল্লে চল্‌বে না। ন'টার গাড়ীতে হরসুন্দর যা'বে, সে কথা যেন মনে থাকে।" তখন হরসুন্দর যে কলের পুতুলের মত আকর্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কোথাও

যেন এতটুকু বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার মত শক্তি তাঁহার মোটেই ছিল না।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সুন্দর! আজ এখন কোথায় গিয়ে উঠ্‌বে মনে করেছ?" হরসুন্দরের যাওয়ার কথাটা, বন্ধুপ্রীতির ও আত্মীয়তার অভ্যন্তরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কথাটার উত্তর দিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইল। বলিলেন "আগ্রা যাব স্থির করেছি।"

রমেশ বলিলেন, "তা হ'লে দেখ্‌ছি বাঙ্গালা মুলুকের মধ্যেই থাকৃছ না।"

হরসুন্দর একটী মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন; পরে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "রমেশ! অনাবশ্যক জীবনভার বহন ক'রে দেশে আর বিদেশে অনর্থক বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও স্বার্থকতা আছে বলে ত, আমার মনে হয় না।" এই কথাগুলি রমেশের অন্তরের এমন একটা নিরাশাসম্ভূত উৎসাহহীন নিষ্ঠুর অননুভূত বেদনা জাগাইয়া তুলিল, যে তিনি ব্যাকুলভাবে বন্ধুর হাত দুখানি আপনার হাতের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটা গভীর দুঃখের ঘনায়মান অন্ধকার যেন সমগ্র কক্ষখানি সহসা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে রমেশ কোমলকণ্ঠে বলিলেন "সুন্দর! তুমি কি এখনও ললিতাকে বিস্মৃত হ'তে পার নাই?"

একথায় হরসুন্দর কিছুমাত্র উদ্বেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। বরং খুব শান্ত ও সহজ ভাবেই বলিলেন, "রমেশ! তুমিত ললিতাকে জান! তাকে কি এজীবনে আর ভোলা যায়! মানুষের গড়া নিয়ম মেনেই কি সব কাজ অনুষ্ঠিত হয়? তা হয়না রমেশ! কেবল মন্ত্রের ও সমাজের বন্ধন দিয়াই কি সকল মানুষের সকল সম্বন্ধ চিরস্থির হয়ে আছে? তুমি হয় ত আমার কথায় খুব আশ্চর্য্য হচ্ছো?"

রমেশ তাড়াতাড়ি "বলিলেন, না, না, আমি সে সব কথা কিছু মনে করিনি?"

হরসুন্দর পুনরায় বলিতে লাগিলেন "মানুষের গড়া সমাজ-শক্তির উপরও আর একজনের অজেয় শক্তি মানুষের মনের উপর খুব গভীর ভাবেই তার ক্ষমতা বিস্তার করে, সে কথা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? অনেকসময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মন্দির ও দেবতা উভয়ই কালের প্রভাবে অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু তথাপি প্রতিষ্ঠিত দেবতার নাম যুগযুগান্তর ধরে সেই ক্ষুদ্রস্থানটীকে ঘেরে বেঁচে রয়েছে। কেবল সমাজের সম্বন্ধই যে মানুষের খুব বড় টেঁকসই সম্বন্ধ, তা বলা যায় না, কারণ, মনের সম্বন্ধই হচ্ছে সব চেয়ে বড়

রমেশ বলিলেন, "সেকথা কেহ অস্বীকার কর্‌তে পারে না।"

হরসুন্দর বলিলেন, "ললিতাকে পর ভাব্‌তে না পার্‌লে

ত আর ভুলতে পারি না। যা সত্য ব'লে জানি ও বিশ্বাস করি, তা ত্যাগ করতে পারি না। পারিনা বলেই, তা যদি পাপ হয়, আর সেই পাপকে গোপন করার নাম যদি ধর্ম্ম হয় তবে সে ধর্ম্ম আমার কোন দিন প্রয়োজন নাই। ললিতাকে পরের মনে করবার বহুপূর্ব্বে, সে যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রেমের আসন পেতেছিল, সে কথা কি তুমি জান না? যখন আমার সঙ্গে তার বিবাহের কথা ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল, যখন ললিতার পিতা এই সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে যাবার পরও কতদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছেন; যখন ললিতাকে মনে মনে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বদিক থেকে, আমার বলে ভাববার অবসর ও অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তখন কতদিন, সে সরমে-সম্ভ্রমে আমার কাছে আমার মানসীদেবীর সৌন্দর্য্যে ও সম্পদে, আনন্দে ও উদ্বেগে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার উপর তার কি অখণ্ড ও অব্যাহত প্রভাব আছে, তা যদি রমেশ বুঝতে, তাহ'লে তুমি কখনও এমন কথা বলতে পারতে না। ললিতা বিবাহের এক সপ্তাহ পরে বিধবা হয়, সে কথাও তুমি জান—বলিতে বলিতে, হরসুন্দরের কণ্ঠস্বর রোদনরুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার নয়নপ্রান্তে সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু আলোকসম্পাতে মুক্তার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। রমেশ বলিলেন "ললিতার পিতা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, তা হ'লে, ললিতার কাকা কখনই এমনটা করতে পারতেন না।"

হরসুন্দর বলিলেন "যাঁহাদের শাস্ত্রে বাক্যদান করার মধ্যেই কার্য্যের সম্পূর্ণতাই সূচিত করে, তাঁহারা অম্লানবদনে সমাজের বক্ষের উপর দাঁড়িয়ে এত বড় নিষ্ঠুর অন্যায়, স্বার্থপর আচরণটা কল্লেও কোন দোষ হয় না। বরং গর্ব্বভরে সমাজ তা বুক পেতে নেয়, এটা কি কেউ একবার ভাবে ?"

রমেশ কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "এস ভাই খাবার দিয়েছে। তোমার আবার গাড়ীর দেরী হ'য়ে যাবে।"

সেদিন হরসুন্দর বন্ধুর নিকট বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ বন্ধুর বেদনাপীড়িত অন্তরের করুণকাহিনী সম্পূর্ণ অবগত থাকায় চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রমেশ বলিলেন, "চিঠি লিখ্‌তে যেন ভুলো না" হরসুন্দর মস্তক নাড়িয়া জানাইলেন, "না।" এতখানি স্নেহ, এতখানি যত্ন, এতখানি আত্মীয়তা হরসুন্দর অনেকদিন পান নাই। সুতরাং আজ তাঁহার সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া একটা করুণ ক্রন্দন যেন সারা বিশ্বের উপর আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার অন্তর একটা অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য বেদনায় তাঁহার বক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাহার উদ্দেশে লুণ্ঠিত হইয়া ফিরিতেছিল। হরসুন্দর একটা গ্যাসের ম্লান আলোর দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিলেন।

৬

যোগেশবাবু তাঁহার পড়িবার ঘরে আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতেছিলেন। প্রতিদিন তিনি আদালত হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ অন্দরে বিশ্রাম করার পর বাহিরে আসেন। সে দিন, কিন্তু সে নিয়মের অকস্মাৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া, সরলা ধীরে ধীরে পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীকে গভীর চিন্তামগ্ন অবলোকন করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া নিকটে বসিল ও মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে যোগেশ একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তুমি যে এখানে এসে হাজির ?"

"চা টা না খে'য়ে, একেবারে পড়বার ঘরে এলে কি না, তাই ডাকতে এসেছি ; আজ শরীরটা কি ভাল নেই ? জলখাবার কি এখানে এনে দেবো ?"

যোগেশ একটু সরল হইয়া উঠিয়া বসিলেন, "বলিলেন আজ মনটা বড় ভাল নেই। এত বয়স হ'লো কিন্তু,সেই একভাব ; নিজে যা বুঝ্‌বে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যদি মাথা খুঁড়ে মরে তবু সে তা'র জিদ্ ছাড়বে না। তোমার এখানে বোধ হয়—আসে নি ? চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যাক্।"

সরলা বলিল "কার কথা বল্‌ছ, সুন্দর ঠাকুরপোর ?"

"হ্যাঁ, আজ আমার অপিসে গিয়েছিল" বলিতে বলিতে উভয়ে অন্দরে গিয়া বসিলেন। সরলা জলখাবার দিয়া নিকটে উপবেশন করিল, বলিল "হ্যাঁ, তারপর কি বল্‌লেন ?"

"আজ সে এতক্ষণ দেশ ছেড়ে চলে গেছে! কোথায় যাবে, জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, দেশ-ভ্রমণে যাচ্ছি। কোথায় গিয়ে উঠ্‌ব—ঠিক বলা যায় না।"

একথা শুনিয়া সরলা অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইল জিজ্ঞাসা করিল "কই আমার সঙ্গে ত দেখা কর্‌তে আসেন নি। সুরমাও ত কোন সংবাদ দেয় নি। তোমার আপিসে ত কখনো যান না, তা কি বল্লেন? সুরমার সঙ্গে কি কোন ঝগড়া হ'য়েছে, না, তাতো হ'তেই পারে না; তিনি ত ঝগড়া করবার লোক নন।" যোগেশ চা'য়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন "আমিত তাকে দেখে অবাক্। একটা উইল করার জন্য মহা ব্যস্ত। বল্লাম এরপর তখন দেখেশুনে কর্‌লে হবে, তোমার বৌ-দিদির সঙ্গে একটা পরামর্শ কর, এত তাড়াতাড়ি কেন? তার উত্তরে বল্লে, আজই রাত্রির গাড়িতে যাব; সময় নেই। আমাকে মাপ কর যোগেশ-দা, তোমাকে বোঝাতে পারব, কিন্তু বৌ-দির কাছে যাবার মত আমার সাহস নেই।" এই কথা গুলি বলিতে বলিতে যোগেশবাবুর স্নেহকরুণকণ্ঠস্বর যেন দুঃখে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এতদিন সরলা মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা যে, আজ সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে শুনিয়া তাহার নারীহৃদয়ের মধ্যে সুরমার বর্ত্তমান অবস্থাটী গভীর দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র উপেক্ষা ও ঘৃণার শানিত অস্ত্র কে যেন অকস্মাৎ প্রবল বেগে টানিয়া উতপ্ত-রক্তের খরবেগ বহাইয়া দিল। একটুখানি মায়া, এতটুকু বেদনা কি সে নিষ্ঠুর পায় নাই? বিচারের মধ্যে কি সে, একদিনের জন্য নিজেকে হাজির করার মত সাহস রাখে না? সুরমার দোষ কোন্ খানে? সে নীরবে সব সহ্য করে, তার অন্তরের কথা কাহাকেও জান্‌তে দেয় না, বা কেউ জান্‌বার মত অবসর পায় না, এই না তার অপরাধ? সরলা যেন নিজেকে বেশ সাম্‌লাইয়া লইতে পারিতেছিল না। সে যে, তার স্বামীর সম্মুখে বসিয়া আছে, একথাটাও তখন তার মনে ছিল না। সুরমার সমস্ত মনটী সরলার স্নেহের ভিতর দিয়া হরসুন্দরের আচরণের বিষয় ভাবিতেছিল। এই ঘটনাটী যে হরসুন্দরের চরিত্রের উপর একটা অন্যায়ের ছাপ মারিয়া দিয়াছে, এক কথা সরলা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না; এবং হরসুন্দরের জন্যও সে যে, চিন্তিত না হইতেছিল, তাহাও বলা যায় না।

সরলা জিজ্ঞাসা করিল "কি উইল কর্‌লেন?" এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মোটেই তার প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু কি যেন বুঝিবার জন্য এ কথাটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকা

তার পক্ষে একটা অপরাধ বলিয়া মনে হইতেছিল। সরলা মনে মনে ভাবিতেছিল, বেদনা পাবার মত মন যে কেবল একটী মানুষকে ভগবান্ দিয়াছেন, তা নয়। সুখ দুঃখ বুঝিবার মত হৃদয় সকলের আছে। একজনের দুঃখ তোমাকে খুব বেশী ক'রে বেদনা দেওয়া যেমন সম্ভবপর, তেমনি আর এক জনের হৃদয়ও ঠিক যে সেই একই কারণে বেদনা পেয়ে আস্ছে, সেটা না ভাবাও হচ্চে মহা পাপ।

যোগেশবাবু বলিলেন "দেখ সরলা, আমি মনে করেছিনু, হয় ত বা উইলে সুরমাকে কিছু দেন নাই, কিন্তু তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেকই সুরমাকে দান করেছে। সে তীর্থ-ধর্ম্ম করার জন্য সমস্ত টাকা ব্যয় কর্‌তে পারে। বাকি অর্দ্ধেক হ'তে সিকি দিয়াছে, আতুর-আশ্রমে, অবশিষ্ট সিকি দিয়াছে ললিতাকে।"

মন্ত্রমুগ্ধার মত সরলা রুদ্ধ-নিশ্বাসে, বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে কথাগুলি নির্ব্বাক্ হইয়াই শুনিয়া গেল। কোন উত্তর দিল না।

যোগেশ ও সরলা উভয়ে অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া রহিলেন। যোগেশ মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন, আজিকার এই ঘটনাটী সরলার অন্তরে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছে। সে এমনই একটা আশঙ্কার কথা, অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিল, সরলার কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষেত্রে, যোগেশ তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেদিন, যোগেশ যখন সুরমার নিকট দরখাস্তের কথা তোলেন সেকথায় তখন সরলা বেশ একটু অভিমান ও রাগ প্রকাশ

করিয়াছিল। সে কথাও তাঁর মনে ছিল। সুতরাং বেশ স্পষ্ট করিয়া যেন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থিত করিতে, তাঁহার সাহস হইতেছিল না। হরসুন্দর চলিয়া যাওয়ায় ও উইল করায়, যে যোগেশের দুঃখ হয় নাই, তাহা নয়। তিনিও সহাধ্যায়ীর জন্য মনে মনে, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু কোন উপায়ই আবিষ্কার করা, তাঁহার পক্ষে খুব অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এই সময় সরলা একটু স্থিরভাবে বলিল "উইলে আর কিছু লেখা আছে? ঠাকুরপো লেখাপড়া জানেন, মূর্খ নন, চিরদিন কিছু এমন করে কাটবে না। জীবনের একটা শেষ ত আছে?"

যোগেশ বলিলেন, "মানুষ অনেক সময় ভ্রমকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরে বলে, দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়ে তা'কে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।"

সরলা বলিল "একথা ঠিক, কিন্তু ঠাকুরপো যা'কে না পাওয়ার জন্য আপনাকে ইচ্ছে করে পীড়ন কর্‌ছেন, তা'কে পেলেই যে তাঁ'র সুখ হ'ত একথা শুধু কল্পনা ভিন্ন কি বল্‌ব? দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকলে, যে নিজের মাথা দিয়ে কেবল রক্ত পড়া ভিন্ন, তাতে দেওয়ালের কোন ক্ষতি হয় না, এটা তাঁ'র জানা উচিত।"

যোগেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,

অবশ্য তুমি হয় ত অনেকটা বুঝতে পার ; সুরমা কি হরসুন্দরের এই অবজ্ঞার ভাবটা, উপেক্ষার চক্ষে দেখেন ? এবং সেজন্যই কি তার নিকট হ'তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। স্ত্রীলোকের একটা মহৎ দোষ হচ্ছে, তার দুর্জ্জয় অভিমান। যেখানে তার আইনসঙ্গত দাবী আছে, সেখানে সে অভিমান ক'রে, পরের মত নিজেকে হটিয়ে আনে এবং এ আনার মধ্যে ষোলআনা রকম আঘাত দেবার অভিসন্ধি, যে না থাকে, তা কেমন করে অস্বীকার করব ? এই সব কারণে অনেকক্ষেত্রে যা কোন দিন হবার কথা নয় তাই সংসারে অনায়াসে ঘটে থাকে।"

যোগেশের স্ত্রীজাতির প্রতি এত বড় আক্রমণটা সরলা বিনা আপত্তিতে স্বীকার করা নিতান্ত অন্যায় মনে করিল। এই আক্রমণের ভিতর দিয়া, এই অবকাশে সুচতুর যোগেশ, যে তাহাকেও হুল ফুটাইতেছিল, সে কথাও সরলা বুঝিল, বলিল "অভিমানটাই যে বিধাতা স্ত্রীজাতির একচেটে সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন, তা বোধ হয় কোন শাস্ত্রে লেখে নাই, তবে জানি না, তোমাদের আইনের কেতাবে কি বলে ?"

যোগেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন "বিধাতা তেমন কোন নিয়ম বেঁধে দেন নাই সত্য, তবে স্বভাবগত যে ভাবটা যা'দের বেশী, তা'দের সেই প্রকৃতির লোক ব'লে ধরাই হচ্ছে, মানুষের নিয়ম—তোমার এই আপত্তিই, তোমার অভিমান নয়

কি ? রাগ কর না, একটু ভেবে দেখ্‌লে, বুঝ্‌তে পার্‌বে আমার যুক্তিটা, উড়িয়ে দেবার মত তুচ্ছ নয়।”

সরলা বলিল, “আমরা যে শুধু অভিমান কর্‌তে পারি, আর কিছু পারি না, আর এটাই হচ্ছে, আমাদের মহৎ দোষ, একথা কোন যুক্তি দিয়ে স্বীকার করা যায় না ? আমরা অভিমান করি ব’লেই এখনও সংসার দাঁড়িয়ে আছে, নইলে কবে, কোন্‌দিন, তোমাদের যথেচ্ছাচারে কোথায় যে ভেসে যেতো, তার কোন সন্ধান পেতে না। যারা অভিমান কর্‌তে জানে না, তারা নিশ্চয়ই ভালবাসতে জানে না। অভিমানই ত ভালবাসার পূর্ব্বরাগ, এ কথাটা হুজুরের জানা উচিত ছিল। ঠাকুরপো অভিমান করতে জানেন না বলেই, সুরমাকে ভালবাসতে পারলেন না।”

যোগেশ সরলার মুখের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “সুরমা তাহ’লে হরসুন্দরকে ভালবাসে.একথা প্রতিপন্ন করাই হচ্ছে, তোমার আসল মতলব ; তাই যদি সত্যি হয়, হর সুন্দরকে এতদিনেও সে কথা বোঝাতে পার্‌লে না কেন ? তাহ’লে হরসুন্দরকে বাড়ী ছেড়ে বেরুতে দিলে কেন ?”

সরলা একটু অভিমানসূচক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন “পুরুষমানুষগুলা নিজেদের যত্ই বুদ্ধিমান্ ভাবুক না কেন—আমাদের হাটে অনেক সময় তাদের মূল্য কানাকড়ির বেশী নয়। তুমি কি বল্‌তে চাও, যে সুরমা বোকা মেয়ে, আপনার মঙ্গল খোঁজে না ?

সে অভিমান ক'রে আঘাত দেবার মতলবে কেবল ফির্ছে? তা নয়। সুরমা, ঠাকুরপোকে যথেষ্ট ভালবাসে, ঠাকুরপোর মনের মধ্যে যে কি ভীষণ পীড়ন চল্‌ছে, তা, সে যত বেশী ক'রে প্রাণের মাঝে অনুভব করে, ততটা আর কেউ করতে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। সেজন্য, সে নিজেকে তাঁর চ'খের সাম্‌নে থেকে, অনবরত সরিয়ে রাখ্‌তে প্রয়াস পায়। কোন রকমে ঠাকুরপোকে তার নিজের কথা ভাব্‌বার সময় বা সুযোগ দেয় না। সুরমার বড় আনন্দ, যে তার স্বামী সত্যি করে, একজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে। সুতরাং সুরমা কি সেখানে শত্রুতা কর্‌তে পারে? এতটা হীনপ্রবৃত্তি নিয়ে সে জন্মায় নি।"

যোগেশ বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "বল কি? তোমার কথায় আজ একটা নূতন মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ছে।"

সরলা বলিল, "একদিন সে তর্কস্থলে আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল্লে, দিদি আমার নিজের জন্য একতিল দুঃখ নাই, যদি এমন কোনো উপায় থাক্‌ত, যাতে উনি সুখী হ'তে পার্‌তেন, তা'হলে আমি তা কর্‌তে এখনই প্রস্তুত। আমি স্ত্রী, কিসে ওঁর মঙ্গল হবে, সেটা দেখাই হচ্ছে, আমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। যদি আমাকে একেবারে এ সংসার থেকে, চিরদিনের জন্য সরিয়ে ফেল্লে, তিনি সুখী হ'তে পারেন, তাহ'লে সে কাজ কর্‌তে, আমি এখনি রাজি আছি। আমার নিজের জন্য ওঁকে ব্যস্ত কর্‌লে, কেবল নির্ম্মমভাবে স্বার্থপরের মত ওঁকে পীড়ন করা ছাড়া আর কি

বল্‌ব বল ? তাঁর দুঃখের অর্দ্ধেক ভাগ ত আমার, কিন্তু, ভাগ না নিয়ে, কেবল আপনার অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য লড়াই করাটা, আমার কাছে অত্যন্ত স্বার্থপরতা ব'লে মনে হয়। নারী-মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে যদি না পারি, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

যোগেশ বলিলেন "সরলা! সত্যি এতটা বুঝ্‌তে পারিনি, আমাকে মাপ কর।"

সরলা বলিল, "এখন বল, এর মধ্যে কোন্‌খানে তার অভিমান আছে ? সুরমা কত বেশী ক'রে, তার স্বামীকে বুঝছে দেখ্‌ছ ত ? সে যে সমানে ঠাকুরপোর সঙ্গে তাঁর দুঃখের অংশ নিচ্ছে—শুদ্ধ নিচ্ছে বল্লে, বোধ হয় সুরমাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান করা হয়।"

যোগেশ নির্ব্বাক হইয়া সরলার কথা শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "আমি সুরমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেছি, কিছু মনে করো না। বাইরে থেকে সব জিনিস ঠিক বোঝা যায় না। এতটা উচ্চ-হৃদয় নিয়ে যে, সে ঘর করে, তা বুঝা খুব কঠিন।"

"আমার বড় দুঃখ, ঠাকুরপো যদি একদিনও এ সংবাদ জান্‌তেন, তা হলে, তাঁর ভালবাসাটাকে আর একজন যে কতখানি সত্যি কার ক'রে নিতে পারে, তা বুঝ্‌তে পার্‌তেন।"

যোগেশ বলিলেন, "ললিতার কাকা লোকটা যেন কেমন ধারা, সব বিষয়ে একগুঁয়ে—কোন একটা উদ্দেশ্য নেই, হৈ হৈ

করাই যেন মস্ত বুদ্ধিমানের পরিচয়। যাক্, কাল তুমি একবার সুরমার সঙ্গে দেখা কর। এখন তাকে কোন কথা বলবার দরকার নাই। হরসুন্দর কিছু ব'লে গেছে কি না, সেই সংবাদটা নেওয়া প্রয়োজন।"

"তুমি না বল্লেও, আমি কাল যাব স্থির করেছি"

৭

রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রেমবিহ্বলা যমুনা আকুল অন্তরে যেন তাজের চরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই তুষার-শুভ্র-মর্ম্মর স্তূপের কোনখানে একরত্তি কঠিনতা মোটেই আছে বলিয়া মনে হয় না। অপূর্ব্ব প্রণয়-প্রীতির স্মৃতি দিয়া যেন বিশ্বজয়ী প্রেমিকের এই বিরাট প্রেম-মন্দির, কোনও কল্পনাকুশলশিল্পীর ভাব-পূর্ণ-বৈচিত্রের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। উহা যেন কোনও প্রেমিকের নিভৃত হৃদয়ের প্রেমবিহ্বল অন্তরখানি বিপুল বিরহ ব্যথার আশঙ্কায় শুভ্র শেফা-লিকার মত নিশান্তে আপনাকে বিছাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর তাজ আজ বসন্তপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাযামিনী বক্ষে ধারণ করিয়া হর্ষবিহ্বল! হরসুন্দর, আত্মবিহ্বলভাবে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া বসিয়া তাঁহার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মধ্য দিয়া আপনার ব্যর্থজীবনের সমালোচনা করিতেছিলেন। এই সমা-লোচনা করিতে করিতে, যখন ললিতার কথা মনে আসিয়া পড়িতেছিল, তখনই সেই চিন্তার মধ্যে যে এক অননুভূত আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার স্পর্শে, যেন এই বিরাট সমাধি-মন্দির পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। আর সেই সঙ্গে হরসুন্দরের নিভৃত অন্তরের নির্জ্জন প্রদেশে একখানি প্রগাঢ়

প্রেমের পরিচিত মুখ, বিষণ্ণব্যাকুল অপলক দৃষ্টিতে বার বার উঁকি মারিতেছিল। কোথা হইতে অকস্মাৎ কতকগুলি পাখী সশব্দে তাঁহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়ায়, তাহাদের পক্ষপুট-সঞ্চালন-শব্দে হরসুন্দরের চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উঠিয়া তখন ধীরে ধীরে বাসাভিমুখে ফিরিলেন। আজ তিনি তাজের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। এই মৌন-মুখ প্রেমগর্ভ পাষাণ সঙ্গীটী হরসুন্দরের মনের কথা বুঝিত বলিয়াই, হরসুন্দর আজ আগ্রা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হরসুন্দর বিশ্বপ্রেমিকের প্রেম-লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধামের জন্য যাত্রা করিলেন। হরসুন্দর মনে করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি তাঁহার মানসী-প্রতিমার তপস্যা করিবেন। যাহাকে না পাইলে একজনের জীবন চির-জীবনের জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়, যাহার দর্শনে, একজনের জীবনের সকল সুখদুঃখ, জীবনমরণ, পাপপুণ্য মুহূর্ত্তে সব এক হইয়া যায়, যাহাকে পাইলে আর কিছু না পাইবার অতৃপ্তি হৃদয়ে স্থান পায় না সেই দয়িত বাঞ্ছিতের প্রাপ্তির মধ্যে বিধাতার একি নিষ্ঠুর অভিশাপ! একি অসহ্য পরিহাস!!

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হরসুন্দর বৃন্দাবন পৌঁছিলেন। একজন পাণ্ডার সাহায্যে একটী কুঞ্জে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কুঞ্জটির নাম "মাধবীকুঞ্জ"। বাড়ীটি খুব বৃহৎ না হইলেও খুব ছোটও নয়।

পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন "বাবু! আজ কি আরতি দেখ্‌তে যাবেন? না, কাল সকালে যমুনাস্নান ক'রে গোবিন্দজিউ দর্শন কর্‌বেন?"

হরসুন্দর পাণ্ডাজির হাতে একটী রজতমুদ্রা দিয়া বলিলেন "আমি এখানে কিছুদিন থাকৃব মনে করেছি, তাড়াতাড়ি কর্‌বার কোন দরকার নাই। কাল একবার যখন হোক এসো, তারপর সব ঠিক কর্‌ব?"

একটা গোটা টাকা হাতে পাইয়া পাণ্ডাজি আনন্দে একগাল হাসিয়া উত্তর করিল "সেই ঠিক, বাবু! সেই ঠিক। আপনি যখন দিন কতক থাকৃবেন বল্‌চেন তখন আপনাকে সব তীর্থ করিয়ে দেবো, কিছু ভাব্‌বেন না। আমাদের চারপুরুষের বাস—ঠাকুর জিউর সব জায়গা আমার জানা। কোথায় কোন্ লীলা করেছেন, সব দেখিয়ে দেবো।" তারপর পাণ্ডাজি কণ্ঠস্বর একটু ছোট করিয়া নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল "আপনাদের ভরসা ক'রেই আজও বেঁচে আছি। আমার সংসারে খেতে দশটি লোক। দেখ্‌বেন যেন আর কাউকে পাণ্ডা ঠিক কর্‌বেন না।" তারপর একেবারে হরসুন্দরের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "কাল বেলা দশটার সময় আস্‌ব। এখন আসি বাবু। আমি কুঞ্জস্বামিনীকে ব'লে দিয়েছি আপনার

যা কিছু দরকার হবে সে এনে দেবে” বলিয়া পাণ্ডাজি নূতন শিকার অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। বাটীর দ্বিতলে যে একটীমাত্র কক্ষ ছিল, হরসুন্দর তাহাই দখল করিলেন। বিছানার খানিকটা খুলিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে শয়ন করিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধমুক্ত অবস্থায় বিছানার মোট পড়িয়া রহিল। ভাল করিয়া শয্যারচনা করা হইল না। সেই অবস্থায় হরসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। রাজপথে প্রহরীরা “রাধারাণী কি জয়” ঘোষণা করিয়া পাহারা দিতেছে। দূরে দেবালয়ের উপর দুই একটী আলো ম্লানপ্রভ হইয়া কোনও রকমে জ্বলিতেছে। হরসুন্দর শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। নানাবিধ চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। কোনটীই বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বড় বেশীক্ষণ থাকিতেছিল না। এমন সময় মনে হইল, ললিতা কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহার হৃদয়-মন্দিরের প্রেমোজ্জ্বল হেমসিংহাসনখানিতে আজও কোন দেবতার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করে নাই? ললিতার বিবাহের দিন আমি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। ওঃ! সে কি নিষ্ঠুর আমন্ত্রণ! তাতে সে যেন অত্যন্ত উপায়হীনার মত শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়াছিল। সে মুখে, সেদিন সমাজের তত্ত্বড় সংস্কার ও উৎসবটা উড়াইয়া দিবার যে দীপ্ত

অবজ্ঞার ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কখনও কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ললিতার মুখের সেদিনের ভাব আজিও শুকতারার মত চক্ষুর সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

গোপনে এই বিবাহের পূর্ব্বদিন ললিতা হরসুন্দরকে একখানি পত্র দিয়াছিল। হরসুন্দর বুকের ভিতর হইতে সেখানি বাহির করিয়া পড়িল। হরসুন্দর সেখানি মহামূল্য মাণিকের মত বুকের মাঝেই লুকাইয়া রাখিতেন। যখন দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিত তখনই সেই পত্রখানি পড়িয়া বুকে চাপিয়া যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। পত্রে ললিতা বেশী কথা লেখে নাই। শুধু লিখিয়াছিল "তুমি নিমন্ত্রণ আসিতে অন্যথা ক'রো না,—আমি নিশ্চয় মনে কর্‌তে পারি, যে কাকার এই আচরণ তোমাকে এতটুকু আঘাত দিতে পার্‌বে না। আমার খুব সাহস ও বিশ্বাস আছে, যে তোমার মুখে আমাকে এতটুকু লজ্জা পাবার মত কোন ভাবই দেখ্‌তে হবে না। তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার সমাজ আর আমার রাখ্‌বে কি না জানি না, তুমিও বোধ হয় আমাকে পত্র লেখা উচিত নয় বিবেচনা ক'রে লিখ্‌বে না। দণ্ড দিয়ে, কয়েদ ক'রে দেহটাকে আটক ক'রে রাখ্‌তে পারা যায় সত্য, কিন্তু মনের মন্দিরে একটী দেবতারই অধিকার আছে। সেই অন্তরের মানুষটি ভিন্ন সে মন্দিরদ্বার আর কেউ উন্মুক্ত করতে পারে ব'লে, আমার মনে হয় না।"

চিঠিখানি পড়িয়া হরসুন্দর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই পত্রখানি তিনি যে কতবার পড়িয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যখনই তিনি পত্রখানি পড়েন, তখনই তাঁহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। ললিতা যে তাঁহারই, এমনই একটা আশ্বাস ও বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়মন্দিরে আনন্দ মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়া ললিতার অচির আগমনের অসহ্য প্রতীক্ষায় তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

হরসুন্দর দেখিলেন, তিনি যেখানে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন ; ঠিক তাহারই পশ্চাতে একটী বাতিদানে আলো জ্বলিতেছে, আলোর নিকটে একটী পাত্রে কিছু মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস জল রহিয়াছে। ভাবিলেন, কে এতটা দয়া ক'রে এসব রেখে গেছে! এই সময় অকস্মাৎ ঘরের একখানি ছবির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ছবির কাচখানির উপর এত ধূলা ও ঝুল জমিয়াছে, যে সে আবরণ ভেদ করিয়া তাহার আত্মপ্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও অচিরে যে সে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধূলা ও ঝুলের কবল হইতে ছবিখানিকে মুক্তি দিবার জন্য একটা অদম্য আগ্রহ ও অদ্ভুত উৎসাহ সহসা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি ছবিখানি দেওয়াল হইতে খুলিয়া, মুছিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিলেন। যখন কাচের ভিতর হইতে ছবিখানি বেশ সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হইল, তখন হরসুন্দর অপলকদৃষ্টিতে ছবির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছবিখানি

খুব সাধারণ। রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার লইয়া অঙ্কিত। কিন্তু জানি না, কেন হরসুন্দর সে দিনে, সে ছবিখানি দেখিয়া তত মুগ্ধ হইলেন। ছবিখানি হাতে লইয়া হরসুন্দর অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া রহিলেন। যখন ভোরের আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবগণ পথে টহল দিতে দিতে ফিরিতেছিলেন, তখন হরসুন্দর তাড়াতাড়ি উঠিয়া যথাস্থানে ছবিখানি রাখিয়া দিলেন।

৮

বিবাহের পর সাত দিনের দিন ললিতা বিধবা হয়। সুতরাং শ্বশুর-গৃহে ললিতার একরূপ প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ললিতার স্বামীর অকালমৃত্যুর জন্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক ললিতাকে সর্ব্বদিক হইতে দায়ী করিয়া তুলিল। শাশুড়ী তাহার সহিত অকারণ এমন অকরুণ প্রাণহীন ব্যবহার করিতেন, যে ললিতা কোনো কোনো সময় মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। কিন্তু মুখ বুজিয়া সকল কথা সহ্য করিত। একরত্তি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিত না। এত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা যখন ললিতাকে এতটুকু উত্তেজিত করিতে পারিত না, তখন সকলেই বলিত "লজ্জাঘেন্নার মাথা খাওয়া এমন নিলর্জ্জ মেয়ে বাপের জন্মেও দেখিনি।" সংসারের সকল কাজের মধ্যে ললিতা সকলের অগ্রে গিয়া যোগ দিত। কোন দিক হইতে তাহার দোষ খুঁজিয়া না পাইলেও সকল দোষই যে ললিতার এ মীমাংসায় উপনীত হইতে কাহারও এতটুকু বিবেচনার প্রয়োজন হইত না। বিধাতা যাহাকে পৃথিবীর সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করেন, সমাজ তাহাকে প্রতি পদে পদে কঠিন শাসনে, সংসারের সকল সদনুষ্ঠান হইতে চির নির্ব্বাসিত করিয়া যে কেবল তৃপ্ত হয়, তা নয়, বরং নির্ম্মম আঘাত করিয়া অকারণ জঘন্য প্রতিশোধ লইতে সহস্র

ফণা বিস্তার করে। ললিতার হৃদয় কিন্তু এই অশিক্ষিত মানুষ গুলির ব্যবহারে করুণায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। ললিতার জননীও দুই বৎসরের ভিতর তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ললিতা অবশেষে তাহার জ্যেঠাইমার আশ্রয় গ্রহণ করে। ললিতার জ্যেঠাইমা মহামায়া ললিতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনিও খুব অল্পবয়সেই বিধবা হইয়াছিলেন। জ্যেঠাইমাকে পাইয়া ললিতা যেন বহুদিন পরে সংসার মরুভূমির মধ্যে সুশীতল প্রস্রবণের সন্ধান পাইল। জ্যেঠাইমার মত বুদ্ধি-মতী ও জ্ঞানীমানুষ ললিতা আর কখন দেখে নাই। ললিতা প্রায় বলিত "জ্যেঠাইমা! তুমি এ পৃথিবীর মানুষ নও—তুমি কেন এ স্বার্থপর জগতে এলে জ্যেঠাইমা?"

জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, মৃদু হাসিয়া বলিতেন "তোর এক কথা ললিতা, মানুষ পৃথিবীর নয় ত কি স্বর্গের? কর্ম্মশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাওয়া আসার কি শেষ আছে মা—এখানে না এলে, আমরা সত্যিকার মানুষ হবার অধিকার পাব কেন? লোহাকে কতবার পুড়িয়ে পিটে পিটে কামার গড়ন প্রস্তুত করে দেখেছিস্ ত। এখানে বিধাতা যত বেশী ক'রে আঘাত দেন, জান্‌বি তত বেশী ক'রেই তিনি আমাদের তৈয়ারী ক'রে তাঁর কাছে টেনে নিচ্ছেন। আমরা খুব দুর্ব্বল, তাই তাঁকে অপরাধী করি; তাঁকে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ব'লে কতই না অভিযোগ করি—কিন্তু খুব ভাল ক'রে যদি একটু

ভেবে দেখা যায়, তবে দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর সকল অনুষ্ঠান আমাদের ঘেরে রয়েছে।"

জ্যেঠাইমার কাছে ললিতা যে আশ্বাস ও ভরসা পেতো, তা সে আর কারো কাছে পেতো না।

মহামায়া ললিতাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। একদণ্ড কাছ ছাড়া করিতেন না।

এবার মহামায়া যখন তীর্থভ্রমণ করিবার জন্য সব ঠিক করিয়াছিলেন, তখন ললিতা আসিয়া বলিল "জ্যেঠাইমা আমি তোমার সঙ্গে যাব—তুমি একলা যাবে, পথে অনেক কষ্ট হ'তে পারে।" জ্যেঠাইমা হাসিয়া উত্তর করিলেন "তা তুই যাবি আমি জানি। তোকে না নিয়ে গেলে আমার তীর্থকরা হবে না। মন যে এখানেই পড়ে থাকবে না?" এ কথায় ললিতার চোখে জল আসিল। সেখান হইতে ধীরে ধীরে সে উঠিয়া গেল।

৯

একখানি বাড়ীর গাড়ী আসিয়া হরসুন্দরের গেটের নিকট দাঁড়াইল। তখন প্রায় বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র দ্বারবান সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। রমণী অন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

সুরমা দ্বিতলের একটী কক্ষে বসিয়া পাড়ার একটী মেয়েকে নিশ্চিন্ত মনে মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেছিল। এ মেয়েটীকে সুরমা অত্যন্ত ভালবাসিত। গাড়ীর শব্দে গেটের দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল—সে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া সেই দিকে তাকাইল, দেখিল সরলা আসিতেছে। এমন সময় কেন সে আসিতেছে? এক মুহূর্ত্তের ভিতর একটী এলোমেলো চিন্তার স্রোত দ্রুতবেগে তাহার মনের মধ্যে আন্দোলিত হইয়া গেল। সুরমা বলিল, "কনক, তুই একটু বোস্, আমি এখুনি আস্ছি।"

কনক, সুরমার এই আকস্মিক উত্তেজনার কোন কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া মহাভারতের একখানি ছবির দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল।

সিঁড়িতেই সরলার সহিত সুরমার সাক্ষাৎ হইল। সুরমা আনন্দে সরলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল,

"আজ আমার সুপ্রভাত, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, রোজ তার মুখ দেখে উঠ্‌ব—তা'হলে দিদির দেখা পাব।"

সরলা বলিল, "আমি ভেবেছিনু—এমন সময় তুমি হয় ত ঘুমিয়ে থাক্‌বে, আমি এসে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খুব একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ক'রে তুল্‌ব। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানুষের সামান্য একটা মতলব খাটাবারও শক্তি ভগবান তার নিজের হাতে দেন নি। এত সব দেখেও কিন্তু মানুষ একদিনের জন্য তার নিজের বাহাদুরী ত্যাগ করতে রাজি নয়। এই ত্যাগ না করাই হচ্ছে, তার দুঃখের একমাত্র কারণ।"

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে উভয়ে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কনক এই নূতন মানুষটীকে দেখিয়া, একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটী কে? বেশ সুন্দর মেয়ে—এখনও বিয়ে হয়নি দেখ্‌ছি।"

"আমাদের পাশের বাড়ীর নগেনবাবুর বড় মেয়ে, ও এক রকম আমার কাছেই থাকে। বড় ঠাণ্ডা মেয়ে—পড়া শুনায় বড় ঝোঁক, আমি ওর গুরুমশাই হয়েছি।"

"বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে না কি? ওরা? বিয়ে দিলেই হয়, বেশ বড় হয়েছে। তোমার মত গুরুমশাই বাংলা মুলুকে খুব কম।"

"আমাদেরই স্বজাত, ব্রাহ্মণ।"

ইহাদের কথোপকথনে কনক লজ্জায় ঘরের মেঝের দিকে মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে অর্দ্ধবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "মাসী মা—আমি এখন বাড়ী যাই।"

সরলা সস্নেহে মেয়েটীর হাত ধরিয়া বলিল, "কেন যাবে মা," আমি ত কিছু অন্যায় বলি নি। তোমার মাসীমা তোমাকে ভালবাস্‌তে পারেন, আর আমি নতুন মানুষ ব'লে বুঝি ভালবাস্‌তে পারি না? আমি যে এক মুহূর্ত্তে তোমাকে কতখানি ভালবেসে ফেলেছি, তার কি?"

এত কথা এক সঙ্গে কেহ কোন দিন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে নাই। সুতরাং তাহার বালিকা-হৃদয় যে এ কথায় কি উত্তর দিবে ভাবিয়া আকুল হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিল। কোন উত্তর দেওয়া যে তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এমন কথাটাই, তার দৃষ্টি সুরমাকে জানাইয়া দিল। সুরমা বলিল, "ইনিও তোমার মাসীমা হন, ওঁকে প্রণাম কর।"

সরলা বলিল, "থাক্ থাক্, হয়েছে। আমি যে মা তোমাকে দেখ্‌বামাত্র আশীর্ব্বাদ করেছি।"

কনক সরলাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। সরলা বলিল "আচ্ছা মা, এখন কি বাড়ী যাবে? তা এসো, আমি আবার তোমাকে ডাকব এখন।"

কনক চলিয়া গেলে, সুরমা বলিল, মেয়েটীর মা নেই। বাপ আবার বিয়ে করেছেন। বড় গরিব। সৎমা যেমন হয় তার চেয়ে বেশী কিছু নূতন নন। বিবাহের জন্য কে আর তাড়া দিবে বল? বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। আমার এখানে খুব বেশী সময় থাকে। আমিও ওকে বড় ভালবাসি। তাতে ওর মার রাগ হয়, বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু উপায় কি?"

সরলা মেয়েটীকে সুরমার নিকট দেখেই মনে মনে অত্যন্ত খুসী হয়েছিল। কারণ সুরমার যে দীর্ঘ দিন কাটাইবার একটা সঙ্গী জুটিয়াছে এবং সেই সঙ্গী আবার যে তার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সরলার মনের ভার যেন অনেকখানি নামিয়া গেল। তার পর এদিকে সুরমার বাহিরের এই নিশ্চিন্ততা অবলোকন করিয়া, তাহার মুখের উপর বা কথাবার্ত্তার মধ্যে যে এতটুকু চাঞ্চল্য বা দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই, এসব সরলাকে খুব বিস্মিত করিয়া দিল। সে মনে মনে বারবার সুরমাকে তার অসাধারণ সংযমের নিমিত্ত ভূয়সী প্রশংসা করিল। প্রকৃত ভালবাসার মূলে যে একটুখানি স্বার্থগন্ধ থাকিতে পারে না, সে সত্যটা আজ খুব উজ্জ্বলভাবে সরলার নিকট সুরমার আচরণে ফুটিয়া উঠিল! দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। সুরমা হরসুন্দরের জন্য কোনরূপ উদ্বেগ বা চিন্তার কারণ প্রদর্শন করিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরলা বলিল, "এখন আসি ভাই, ঠাকুর-পো থাক্‌তে তখন তুমি প্রায় আমাদের ওখানে

আস্‌তে, আজ কাল ত যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ। কাল কনককে নিয়ে আমাদের বাড়ী এসো।”

সুরমা বলিল, “ওর মা আবার যেতে দিলে হয়?”

সরলা বলিল, “মেয়ে দেখাবার নাম ক’রে নিয়ে যেও, আমার ছোট ভাইএর সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়? তুমি যার গুরুমশাই, তেমন মেয়ে আমাদের বাড়ীতে গেলে, সংসার সুখের হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

সুরমা মৃদু হাসিয়া বলিল, “দিদির ওই এক কথা, তুমি যে আমায় কি মনে কর, কিছু বুঝ্‌তে পারি না!”

সরলা বলিল, “ভাল কথা, ঠাকুরপোকে ত আমার জান্‌তে বাকি নেই—নিশ্চয়ই কোন পত্রাদি দেন নি?”

সুরমা বলিল, “তিনি ত চিঠি দেবেন না ব’লে গেছেন, তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে বল্লে তাঁর প্রতি যে অন্যায় করা হয় সে কথা জানি ব’লেই কোন কথাই বলিনি। যিনি সত্যি ক’রে ভাল বাস্‌তে পারেন, তাঁকে ভগবান ভালবাসেন। সুতরাং তাঁর কোন বিপদেরই শঙ্কা থাকে না।”

সরলা আর বেশী কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় মনে করিয়া বলিল, “তবে এখন ছুটী। কাল যেন মনে থাকে গুরুমশায়ের এ পাঠশাল আমার বাড়ীতেই বস্‌বে। ছাত্রীকে নিয়ে যেতে যেন ভুল না হয়।”

সরলা চলিয়া গেলে সুরমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে

তার গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। তা'রপর বাতায়ন হইতে ফিরিয়া আসিয়া একখানি কেদারায় বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

যোগেশ সরলার মুখে সব কথা শুনিয়া বলিল, "যে মাটীতে বুবু গড়ে, আবার সেই মাটীতে যে ঠাকুর গড়া হয়—এ কথাটা খুব সত্যি ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

পরদিন সুরমা কনককে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে আসিল এবং সরলার ভাইয়ের সঙ্গে এ মেয়েটীর বিবাহের কথা পাকাপাকি স্থির করিয়া রাখিয়া গেল। আরও বলিল, "এ বিবাহের সমস্ত খরচপত্র আমি করব।" সরলা বুঝিল, এমনি করিয়া সে নিজেকে তৃপ্তি দিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

১০

গঙ্গা-স্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহামায়া ডাকিলেন, "ললিতা তুই কই মা, এদিকে আয় ত একবার ?"

ললিতা জ্যেঠাইমার রান্নার জন্য তখন তরকারি কুটিতেছিল, সে, মহামায়ার গলা শুনিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল "আজ এত সকাল সকাল কি ক'রে ফিরলে জ্যেঠাইমা, তোমার আহ্নিক বুঝি এখনও সারা হয় নি ?"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক ধরেছিস্ ত, আজ—গঙ্গার ঘাটে অত্যন্ত ভিড় কি না, সেখানে বস্‌বার সুবিধা হ'লো না। তাই চান ক'রেই বরাবর বাড়ী চলে এলুম।" ললিতা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তখনই আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিল, বলিল, "তুমি ততক্ষণ আহ্নিক সারো—আমি তোমার রান্নার জোগাড় করি," বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, মহামায়া বলিলেন, "ও ললিতা! গেলে হবে না, তোকে যে কেন ডাক্‌লাম, সে কথা ত আমাকে বল্‌বার মোটেই অবসর দিলি নি। আমার এ পৃথিবীতে যা কিছু ক'রবার বা বল্‌বার আছে, তা দেখ্‌ছি তোর হাতে পড়ে দিন দিন সব হারিয়ে ফেল্‌ছি। তুই যেন আমার মা, আর আমি যেন তোর ছোট মেয়ে। কখন কি অন্যায় ক'রে ফেলি এই

আশঙ্কা নিয়ে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে খাইয়ে দাইয়ে নিশ্চিন্ত ক'রে ঘুম পাড়াতে না পার্‌ছিস্ ততক্ষণ যেন তোর সোয়াস্তি নেই। তা বাছা অনেক পুণ্য করেছিলাম, তাই বুড়োবয়সে তোর মত এমন করুণাময়ী মা পেয়েছি।"

ললিতা মহামায়ার এই করুণ অভিযোগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল "জ্যেঠাইমার ওই এক কথা, বেলা কত হ'য়েছে সেটা ত ভাব্‌ছনা, এখন থেকে তাড়াতাড়ি না ক'র্‌লে, বেলা যে বারোটা বাজ্‌বে সে কথাটা কি মনে আছে? কাল রাত্রিতে যে মাথা ধরেছে ব'লে মুখে একটু জল পর্য্যন্ত দিলে না; এমন ক'রে না খেয়ে, অসময়ে খেয়ে কদিন বাঁচ্‌বে জ্যেঠাইমা?"

সত্যসত্যই মহামায়া ললিতার যুক্তির বিরুদ্ধে কোন উত্তর দিতে পারিতেন না। এই বালিকার অপরিসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধা-ভক্তির মধ্যে জ্যেঠাইমার অপ্রয়োজনীয় জীবনটী যেন দিন দিন বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে কর্‌বার যথেষ্ট আয়োজন ললিতা সর্ব্বদিক হইতে করিয়া তুলিতেছিল। তিনি নিজের কোন কষ্টই কোন দিন কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। কোন প্রকারে জীবনের শেষ কয়টী দিন কর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, ললিতাকে স্নেহ করিতে করিতে, এখন যেন জীবনটাকে দীর্ঘ ও স্থায়ী করিতে পারিলে সুখী মনে করেন, কারণ—এখন ললিতার চিন্তা তাঁহার অনবলম্ব জীবনের পথে একটা মস্ত থামা দিয়া সহসা

দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে মায়ার ফাঁস ছিন্ন করা এখন তাঁর পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মহামায়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই ললিতা, আমি মরবনা, তোর জন্য যমের সাধ্যি কি যে আমার কাছে ঘেঁসে। তোর জ্যেঠাইমা কি এর মধ্যে মরতে পারে রে? আর মরলেই কি তুই তাকে সহজে ছাড়বি? এখন যে জন্য তোকে ডেকেছি, সে কথা শোন্। এবার ললিতা একটু রাগ ও অভিমান করিয়া বলিল, "না, আমি তোমার কথা শুনবনা। জ্যেঠাইমার কেবল ওই এক কথা।"

মহামায়া জননীর স্নেহে ললিতার হাতখানি অত্যন্ত আগ্রহে ধরিয়া বলিলেন "অনর্থক রাগ করিস্ কেন ললিতা?" তারপর তাহার মস্তকে এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন "আজ বড় পুণ্যদিন রে, মা-গঙ্গাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম কর্।" তারপর ললিতার চিবুক ধরিয়া হৃদয়ভরা আশীর্ব্বাদ দিয়া তার মুখ-চুম্বন করিলেন।

ললিতা গলায় কাপড় দিয়া ভক্তিভরে মহামায়াকে প্রণাম করিল, এবং একদৃষ্টিতে মহামায়ার মুখে কি অপূর্ব্ব করুণা ও আনন্দের, স্নেহ ও ভালবাসার, প্রীতি ও পুণ্যের সম্মিলন হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, জ্যেঠাইমা! তুমি কে? এমন ক'রে আমার মত হত-ভাগীকে কেন ধরা দিলে!

মহামায়া বলিলেন, "তোকে ডাক্‌ছিলাম কেন জানিস্? এই সময় কাল-শুদ্ধি আছে—এই বেলা বেরিয়ে পড়্‌তে পাল্লে ভাল হয়। মনে কর্‌ছি, আগামী পরশু দিন ভাল, ঐদিনই যাব। আমার কি কি দরকার হ'বে, তা আমার চেয়ে তুই ভাল জানিস্—সেগুলি সব যোগাড় ক'রে রাখ্।"

ললিতা এবার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল "আর আমার কি কি দরকার হবে, তা ত আমি জানি না, সেগুলা কে গুছাবে জ্যেঠাইমা?"

মহামায়া ললিতার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "তুই কি এই বয়সে 'পশ্চিমের' কষ্ট সহ্য কর্‌তে পার্‌বি, তাই দিন রাত ভাব্‌ছি—না—এখন তোর তীর্থ করবার বয়স?"

ললিতা একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি এই বুড়ো বয়সে সব কষ্ট সহ্য কর্‌তে পার, আর আমি পার্‌ব না, এ কেমন যুক্তি? তীর্থ কর্‌বার নির্দ্দিষ্ট বয়স যে একটা থাকৃতে পারে, তা আমি স্বীকার কর্‌তে রাজি নই। ও কথাটা মানুষের নিজেদের গড়া সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর ক'রেই হয়েছে। যখন স্বভাবত মানুষ বয়সের জন্য দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, যখন তা'র সকল ইন্দ্রিয় কাজের বা'র হ'য়ে মৃত্যুর জন্য আরাধনা করে, তখনই যে তা'র তীর্থ-ধর্ম্ম কর্‌বার মত মঙ্গলক্ষণ উপস্থিত হয়—এটা দেখ্‌ছি একটা প্রকাণ্ড ভুল। যখন সে নিজেকে সামলাইতে অপটু, যখন সামান্য পথ হাঁটিলেই সে হাঁপাইয়া পড়ে, যখন তার

দর্শনেন্দ্রিয় একরূপ জবাব দিয়েছে, তখনই বুঝি মনুষ্য-জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করবার মত সময় উপস্থিত হয়? উপলব্ধি করার হৃদয় যখন একেবারেই নেই, সেই সময় হ'তেই তীর্থ-ধর্ম্ম করার সময়, একথা কেমন করে মানি জ্যেঠাইমা? পাঁচবছরে শিশুর হাতে-খড়ি দেওয়ার সময় নির্দ্দেশ করা হয়েছে, কেন না, তখন তার মনের মধ্যে কোন কিছুর ছাপ পড়ে না, বিদ্যাভ্যাসের প্রথম অঙ্কুর সেই তরল শিশু-সুলভ কোমল মনের উপর রোপণ করা হয়—বিশ বছর বয়সের সময় তার হাতে-খড়ির ব্যবস্থা থাকলে, বোধ হয় লেখা পড়া শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত!"

মহামায়া বলিলেন, "না মা, তোর একথা কেউ তুচ্ছ কথা বলে, হেঁসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। ঠিক বলেছিস্; যতদিন সংসার আমাদের সবদিক্ থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করে, যতদিন পর্য্যন্ত সংসারের সকল কাজের মধ্যে আমাদের বার্দ্ধক্য, তা'দের আনন্দ উৎসবের মধ্যে উপদ্রব হয়ে না আসে, ততদিন আমরা সংসারের মায়া কিছুতে কাটাতে পারি না। কয়েদীর মত কেবল জেলখানায় খেটেই যাই, মুক্তির জন্য সুপারিস্ বা দরখাস্ত করি না। আমাদের তীর্থ-ধর্ম্ম করার মধ্যে সত্য সত্যই আন্তরিকতা খুব কম। ধর্ম্ম করবার সময় অসময় নাই, এ কথা ঠিক বলেছিস্। পিতামাতাকে ভক্তি করতে হ'লে, বড় হ'য়ে করবার জন্য ওকাজ তুলে রাখ্‌লে, সে কোন দিনই শ্রদ্ধা

ভক্তি করতে পারবে না, এটা খুব সত্যি। বাবাকে যদি ছেলেবেলা থেকে বাবা না ব'লে, বাবু বলতে ছেলেকে অভ্যাস করান হয়, তবে সে, কোনদিনই আর বাবা ব'লতে পারবে না, আর যদি কোন রকমে সে বাবা ব'লে ডাকতে পারে, তবে তার মধ্যে ষোল-আনা লজ্জা তার পথ আট্‌কাবে! যাঁ'র কাছ হ'তে আমরা এখানে এসেছি, তাঁর কথা সব কাজের শেষে মনে করতে হবে, এতবড় নেমকহারামী কেবল মানুষই করতে পারে। না মা, আর আমি তোকে বাধা দেব না।"

ললিতা বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি যে কেবল তীর্থ বা পুণ্য করবার জন্য তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি তা নয়, তোমাকে ছেড়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। তোমার সেবা করার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

মহামায়া ললিতাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "তোর যা, যা, প্রয়োজন সে সব আমি গুছিয়ে নেব এখন।" ললিতা জ্যেঠাইমার জন্য রাঁধিতে গেল। মহামায়া এক-মনে আহ্নিক করিতে লাগিলেন। সে দিন মহামায়ার ধ্যান-মুদ্রিত নয়ন বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি দেখিতে ছিলেন, ললিতা-রূপিণী এই মেয়েটী তাঁহার জীবনের পথে পুণ্যের আলোক-দীপ হাতে করিয়া পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। ভগবান বুঝি, এই বালিকাটীর ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন।

বৈকালে জ্যেঠাইমা ও ললিতা বসিয়া কোন পথে যাইবেন, তাহা স্থির হইতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন, "আমরা প্রথমে বৈদ্যনাথ যা'ব, সেখানে আমাকে অন্ততঃ দিন পনর থাকতে হবে। বৈদ্যনাথ জায়গা খুব ভাল, খুব বড় মন্দির। ললিতা, তুই দেখ্‌লে খুব খুসী হবি। ললিতা বলিল, "সেখানে অত বেশী দিন থাকবে কেন জ্যেঠাইমা?"

মহামায়া বলিলেন, "তার একটা কারণ আছেরে ললিতা; অনেক দিন আগে, একবার বৈদ্যনাথ গিয়েছিলাম, তখন আমার বাপের বাড়ীর দেশের অজয় বাড়ুয্যের সঙ্গে বাবার মন্দিরে দেখা হয়। সে তখন সেখানে বাড়ী কর্‌ছিল, তার কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে এসেছি, যে বাড়ী হ'লে তখন এসে থাকব তারপর সেও অনেক বার পত্র দিয়েছিল। আর কয়দিনই বা বাঁচ্‌ব? শেষে কি মিথ্যাবাদী হ'য়ে মর্‌ব?" ললিতা জ্যেঠাইমার কথার কতখানি মূল্য তা বেশ বুঝিত, তিনি যা বলেন, হাজার লোকসান হ'লেও তার একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই; এই সত্য প্রতিপালনের কথা হয় ত অনেকের কাছে তত বড় বলে মনে না হ'তে পারে; কিন্তু ললিতার হৃদয় আজ মহামায়ার কথায় আনন্দে ভরিয়া গেল। ললিতা বলিল, "যখন কথা দিয়েছ, তখন থাকতে হবেই, আর তুমি গেলে, তার খুব যে একটা আনন্দ হবে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। ওখান থেকে কোথায় যাবে?" মহামায়া বলিলেন "গয়া হ'য়ে তারপর কাশী যাব;

কাশীতে পৌঁছে, বাবা বিশ্বনাথ যেম্‌নে নিয়ে যান সেই দিকেই যাব। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফের্‌বার বাঁধন ত পেছনে আর কিছুই নেই, ওর আর অত চিন্তা কি?" ললিতার মনে হইতেছিল আজই রাত্রিতে যাত্রা করিলে বেশ ভাল হয়। দুই দিন অপেক্ষা করা যেন অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।

১১

বহুতীর্থ ঘুরিয়া আজ কয়েকদিন হইল মহামায়া ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। মহামায়া একরাশ শুষ্ক-পুষ্প, বেল ও তুলসীপাতা একটী ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলিয়া টিনের কৌটায় রাখিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া ললিতা জ্যেঠাইমার সহিত গল্প করিতেছিল। মহামায়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজ ললিতার যেন মনে সুখ নাই, সে যেন একটু উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণটা ঠিক ধরিতে পারিতেছিলেন না।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল "জ্যেঠাইমা ওসব নিয়ে কি হবে?"

"দেশে নিয়ে যাব, সকলকে দেব মা! দেবতার নির্ম্মাল্য, মাদুলীক'রে ধারণ কল্লে অনেক ফল হয়।" ললিতা বলিল "হ্যাঁ জ্যেঠাইমা,—আর যা'রা দেবতার চরণে এসে পূজা দেয়, তাদের কি হয়?"

জ্যেঠাইমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ললিতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "তাদের মনোবাঞ্ছা কি আর অপূর্ণ থাকে মা," তারপর বলিলেন "ললিতা বেলা অনেক হ'লো, এখনো ত ঠাকুর এলেন না। হয়ত কোথাও আট্‌কে পড়েছেন, কি বলিস্?" ঠাকুর মহামায়ার গুরুদেব। পরম বৈষ্ণব ও সাধক। তিনি বৃন্দাবনে আজ ত্রিশবৎসর বাস কর্‌ছেন। বালোচিত নির্ম্মল স্বভাব—

সিদ্ধপুরুষ। ললিতা অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া একটু ভার ভার গলায় বলিল "না জ্যেঠাইমা এখনো বেশী বেলা হয় নাই, তিনি নিশ্চয় আস্‌বেন, তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়।"

মহামায়া ললিতার চক্ষে জল দেখিতে পাইলেন কি না, বলিতে পারি না তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিতা কৈ তুই আজ আর মহাভারত পড়্‌লি না?" ললিতা বলিল "আজ ভাল লাগ্‌ছে না জ্যেঠাইমা, আজ তোমার কাছে, গল্প শুন্‌ব মনে করেছি। তোমার কথা মহাভারতের চেয়ে, আমাকে বেশী ভাল লাগে।"

জ্যেঠাইমা মৃদুহাসিয়া বলিলেন "পাগ্‌লী মেয়ের ঐ এক কথা—ওকথা কি বল্‌তে আছে রে?"

ললিতা বলিল "ব'ল্‌তে নাই কেন জ্যেঠাইমা, যে কথা আমরা সকল প্রাণ দিয়ে সত্যি বলে জানি, তা বল্‌বার, সেকথা স্বীকার কর্‌বার অধিকার আমাদের নেই? বরং আমার মনে হয় সত্যিকে অঙ্গীকার কর্‌তে যতক্ষণ বিলম্ব কর্‌ব ততক্ষণই আমাদের দুঃখ। সত্যিকে সাদরে বরণ ক'রে নিলেই, সেই চিরসুন্দর সত্যই আমাদের সুখের নিদান হ'য়ে সকল গ্লানি, সকল ভয় সমস্ত লাঞ্ছনা এক নিমেষে দূর ক'রে দিবে, তা'র পর এক অনন্ত অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় সৌভাগ্যের উদয় হ'বে, এইত আমার ধ্রুববিশ্বাস, জ্যেঠাইমা! আচ্ছা জ্যেঠাইমা একটা বড়

সমস্যায় পড়েছি, নিজে নিজে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারি নি—তুমিই সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও—”

ললিতার এরূপ চাঞ্চল্য-ভাব অনেকদিন মহামায়া দেখেন নাই, সুতরাং তিনি একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, ললিতা সমস্যার কথাটা তোলায় তাঁহার মনের বোঝা যেন অনেকখানি হাল্কা হইয়া আসিল। অত্যন্ত আগ্রহসহকারে মহামায়া বলিলেন, “কি সমস্যা ললিতা? তা এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিস্‌নি কেন?” ললিতা বলিল, “বল্‌ব ব’লেই ত আজ মহাভারত পড়িনি—আচ্ছা জ্যেঠাইমা, জ্যেঠামহাশয়ের কথা তোমার মনে আছে? আজো তুমি তাঁকে মনে মনে পূজো কর?”

মহামায়া অত্যন্ত বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে তাকাইলেন। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, “না ললিতা আমার বিবাহের কথাই বেশ ভাল স্মরণ হয় না। তাঁর কথা কেমন ক’রে মনে আস্‌তে পারে বল্! তোর দাদামশাই, কুলীনের ঘরে, আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্বামী নাকি, খুব বড়দরের নামজাদা কুলীন ছিলেন। সে জন্য, তিনি আমার বিবাহের পর দুইবার মাত্র আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি বিবাহ ছিল কি না, আর আস্‌বার সময় পান নি। তখন আমি খুব ছোট, তার পরই আমি বিধবা হই। স্বামীর কোন স্মৃতিই আমার মনে নাই”

ললিতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, “তবে কার জন্য

এই তপস্যা জ্যেঠাইমা ? কার জন্য তুমি বিশ্বের সমস্ত সুখ হ'তে, নিজেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ ?"

জ্যেঠাইমার চক্ষে ললিতা আজ এই প্রথম জল দেখিল। মহাসমুদ্র আজ যেন সহসা বিক্ষোভিত হইল। জ্যেঠাইমা বলিলেন, "সমাজ একদিন হঠাৎ আমার এই বিধান ক'রে দিল। স্বামীধ্যান ক'রে বৈধব্যজীবন অতিবাহিত করাই হচ্ছে হিন্দু নারীর ধর্ম্ম। নারীর স্বামী ভিন্ন আর কেহ নাই, স্বামীই তার সব! কিন্তু সেই সবের সঙ্গেই আমার মোটেই পরিচয় ঘটে নাই! সে কথা কেহ বুঝিল না।" ললিতার মুখ ম্লান হইয়া গেল; সে বলিল "বল কি জ্যেঠাইমা! তুমি যে কেমন ক'রে এতদিন বেঁচে আছ তাই ভাব্ছি। যাঁর কোন স্মৃতি এক দিনের জন্য তোমার মনে একটুখানি আঁচোড় কাটতে পারে নাই, তাঁরই জন্য যে তুমি ব্রতচারিণী সন্ন্যাসিনী, এই কথাইত সমাজ ও সংসার জানাচ্ছে, আর তোমাদের আদর্শ অবলম্বন ক'রেইত সমাজ কথায় কথায় নজির উপস্থিত ক'রে, গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠ্ছে।"

মহামায়া অত্যন্ত বেদনকরুণকণ্ঠে বলিলেন, "তাইত করছে ললিতা! আসল কথাটা কটা লোক প্রকাশ করে। হৃদয়ের কথা, সে অনেক দূরের কথা মা! যিনি সকলের স্বামী, সেই পরম প্রেমময় ঠাকুর আমার শূন্যহৃদয় পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন মা, নইলে কি একতিল তিষ্ঠিতে পারি ?"

ললিতা আর কোন কথা প্রশ্ন করিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে এরূপ মৌন দেখিয়া মহামায়া বলিলেন "তুই আজ কি ভাবছিস্ বলত ?"

"তুমি ত সব কথা জান জ্যেঠাইমা ?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "জানি সত্যি, কিন্তু কৈ এতখানি অধীরতা কোন দিন বাইরে প্রকাশ পেতে দেখি নি যে ললিতা ?"

ললিতা বলিল, "বাঞ্ছিত যখন দূরে তখন কোনদিন তাঁকে পাব এই আশাটুকু নিয়ে প্রাণধারণ ক'রে থাকা তত কঠিন হয় না, কিন্তু জ্যেঠাইমা, চির-প্রার্থিত যখন নিকটে আসিয়া দাঁড়ান, বহুকাল সঞ্চিত বাসনার সার্থকতা যখন হাতের কাছে এসে ধরা দেবার জন্যে দাঁড়ায় তখন আগ্রহ, আশঙ্কা, আনন্দ একসঙ্গে বুকের মধ্যে যে কি বিপ্লব সৃজন ক'রে তোলে, তা কি মানুষের ভাষায় প্রকাশ করবার সাধ্যি কারও আছে ? মিলনের মুহূর্ত্তেই যে বিরহের ভয় বেশী করে অভিভূত করে, জ্যেঠাইমা ! সেকথা কি তোমার অজানা আছে ?"

জ্যেঠাইমা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতা গললগ্নীকৃতবাস হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তিনি অসঙ্কোচে আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'প্রেমের ঠাকুর তোমার বাসনা পূর্ণ করুন।' এ আশীর্ব্বাদ শুনিয়া ললিতা ও জ্যেঠাইমা স্তম্ভিত হইলেন। মহামায়া আসন

পাতিয়া দিলে, গুরুদেব উপবেশন করিলেন। মহামায়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার বিলম্ব দেখে, মনে করলাম, বুঝি কোথাও আটক পড়েছেন, আজ আর আস্তে পারলেন না।"

গুরুদেব তাঁহার অবিন্যস্ত শ্বেতকেশপাশ ললাটের উপর হইতে দুইহস্তে অপসারিত করিয়া স্নেহপ্রবণকণ্ঠে বলিলেন, "না এসে কি পারি মা! তোমাদের ঐকান্তিক তপস্যার ফলে,—প্রেমের ঠাকুরটীর কৃপা একদিন হ'লেও হ'তে পারে।" তারপর ললিতার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "ললিতা তোমার জ্যেঠাইমা বল্ছিলেন, তোমাকে মন্ত্র দিবার জন্য। কিন্তু মা, তুমি যে অনেক পূর্ব্বেই পবিত্র প্রেমের মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করেছ, তার চেয়ে বড় সাধনার কথা আমিত আর জানি না। এই নিখিল বিশ্ব সেই একই মন্ত্র অনন্তকাল ধ'রে জপ ক'রে আস্ছে। এই সাধনপথেও অনেক ব্যাঘ্র ভল্লুক ও ভূত প্রেতের উপদ্রব আছে, তাতে কোন দিন ভয় পেও না। তোমার মন্ত্র অজেয়, তুমি তাতেই সিদ্ধিলাভ করবে।" ললিতার দুইচক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে মন্ত্রমুগ্ধারমত নির্ব্বাক হইয়া সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গুরুদেব মহামায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যেমন সকল নদী যেমন সাগরে গিয়ে মিশেছে, সকল সাধনা, সকল ধর্ম্ম তেমনই একমাত্র প্রেমকে অবলম্বন ক'রে, সেই পরমপ্রেমিকে গিয়ে লীন হয়েছে। হীন দৈহিকমিলনের বিরহবেদনা কামগন্ধের ঘনান্ধ-

কারে সাধকের সকল পথ বিপদসঙ্কুল ক'রে তোলে, তার সাক্ষী এতবড় প্রেমের লীলাটাকে কতলোক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতই না কুৎসিৎ যুক্তিদ্বারা সমর্থন করেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

১২

বড়দিনের ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ হইয়াছে। কত লোক অর্থ ও সামর্থ অনুসারে কত দিকে বেড়াইতে যাইতেছেন। সহসা রেলওয়ে ট্রেনগুলির ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হাওড়া-ষ্টেসনে অত্যন্ত ভিড়। নানাদেশের লোক, নানাবিধ পোষাক পরিয়া, নানাবিধ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সবাই একত্রে ছুটাছুটী করিতেছে। ব্যস্ততা যেন সর্ব্বত্র মূর্ত্তিমান। এই সময়, একদিন সকাল বেলা, যোগেশবাবু সংবাদ-পত্র পড়িতেছেন ও এক এক চুমুক চা খাইতেছেন, শীতের ভোরে এ অবস্থা সত্য সত্যই উপভোগ্য। এই সময়, সেখানে সরলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া যোগেশ বলিলেন, "ভাল কথা, একটা মজার সংবাদ তোমাকে দিতে ভুল হ'য়ে গেছে।" সরলা একটুখানি অভিমান করিয়া উত্তর করিল "সে ত জানা কথা, আমাকে দেবার সময় তোমার অনেক জিনিসই ভুল হ'য়ে যায়। এখন তোমার মজার কথাটা কি বল?"

যোগেশ বলিলেন, "ললিতার কাকা নগেনবাবু লোকটা অত্যন্ত গোঁয়ার,—ভদ্রতার ধার মোটেই ধারে না। আমি ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু এমন নিলর্জ্জ লোক খুব কমই আছে ব'লে মনে হয়।"

সরলা বলিল, "কেন? কি হয়েছে? সে আবার কি করতে এসেছিল?" যোগেশ বলিলেন, "কাল বৈকালে যখন বেড়িয়ে এসে গাড়ি থেকে নাম্‌ছি, দেখি লোকটা আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে, তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কি মনে করে—নগেন-বাবু! অনেক দিন পরে, এ পথে এসেছেন যে?" সে কথার কি উত্তর দিলে, শুন্‌লে তুমি খুব আশ্চর্য্য হবে; বল্লে "আস্‌তে নেই কি মশাই? প্রয়োজন হ'লে সবই কত্তে হয়! মনে করেছিলাম, একখানি উকিলের চিঠি দিয়েই জান্‌ব, কিন্তু ভাব্‌লাম্ আপনার সঙ্গে যখন জানা শোনা রয়েছে, তখন একবার আপ্‌নাকে জিজ্ঞাস্ করায় দোষ কি?"

তার কথা শুনে, আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল; তার কথার উত্তর দিতে মোটেই প্রবৃত্তি এলো না, একবার—মনে কর্‌লাম বলি, বাবু! তাই যদি ভেবেছিলে, তবে চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই হ'ত।

সরলা যোগেশের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "পৃথিবীতে এমনি মানুষই বেশী। যে কাজের মধ্যে তাদের কোনই প্রয়োজন নেই, যেখানে কেউ তাদের মোটেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না, সেখানে এসে অনর্থক একটা গোল বাধানই তা'দের স্বভাব। অপ্রয়োজনে নিজেদের একটা মস্ত কাজের লোক প্রমাণ করাই হচ্ছে, এই সব লোকের সুখ। অন্তর্নিহিত হিংসা

প্রবৃত্তিরবশে অকারণ অন্যের অপকার করাই হচ্ছে এদের আনন্দ, এই হতভাগা লোকটার জন্যই ত ঠাকুরপোর সংসারটা মাটি হ'য়ে যেতে বসেছে। তার পর কি বল্লে?"

আমি কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে আস্‌ছি দেখে সাম্‌নে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে "কি অন্যায় বলুন দেখি, কোন্ ভদ্রলোক এমন কাজ কর্‌তে পারেন? অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, সহ্যের ত একটা সীমা আছে। আমি এবার তাকে রীতিমত শিক্ষা দেব, কেবল আপনার মুখের কথাটা শুন্‌তে এসেছি।"

আমি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বল্‌লাম "আপনি কাকে কি বল্‌ছেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা, আর পথে দাঁড়িয়ে কোন কথার উত্তর দেওয়া আমাদের ব্যবসার রীতি-বিরুদ্ধ এটাও স্মরণ রাখ্‌বেন।" এবার একটুখানি যেন অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে "শুন্‌লাম হরসুন্দর বাবু নাকি উইল্ করেছেন? সেই উইলে তিনি নাকি ললিতাকে তাঁর বিষয়ের একটা অংশ দিয়েছেন? এটা কি তাঁর মত লোকের পক্ষে ভাল কাজ হয়েছে? এত বড় একটা অপমান কর্‌বার তাঁর কি অধিকার আছে? আমি তাঁর নামে নালিশ কর্‌ব" বলিয়া লোকটী রাগিয়া ফুলিতে লাগিল।

আমি বল্‌লাম, "এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই—ভাল বোঝেন, নালিস কর্‌তে পারেন, কোন আপত্তি নাই।"

তখন লোকটা বলিল, "দেখুন, এমনি ক'রেই ত ললিতা কেমন এক রকম হ'য়ে গেছে। আমার কথা মোটেই মানে না। বৌ-ঠাকুরুণ হয়েছেন তার সর্ব্বস্ব, মন্ত্রণাদাতা। আমি কত ক'রে নিষেধ কর্‌লাম, বল্‌লাম, তোর কি এখন তীর্থ কর্‌বার সময়? এত বড় স্পর্দ্ধা, সে কি না আমার কথার উত্তরই দিলে না! বৌ-ঠাকুরুণের সঙ্গে এ তীর্থ সে তীর্থ ঘুরে বৃন্দাবনে গিয়ে রয়েছে। তাও কি আমাকে চিঠি লিখেছে? সঙ্গে, বাড়ীর সরকার রায়মশাই গেছেন কি না, তিনি তাঁর বাড়ীতে চিঠি দিয়েছেন তাই জান্‌তে পার্‌লাম—এতে কি মনে হয়?"

আমি তার কথায় আর কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে এলাম—সে শাসিয়ে গেল যে হরসুন্দরকে একবার দেখে নেবে।

সরলা মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিতেছিল, সে বলিল, "আচ্ছা এ উইলের কথা নগেনবাবু কেমন করে জান্‌তে পার্‌লেন? এটা ত খুব আশ্চর্য্য?"

যোগেশ বলিলেন, "সেই পর্য্যন্ত আমি এ কথাটা খুব ভাব্‌ছি, এ সব অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়—বিশেষতঃ আমাদের অপিস হতেই যে একথা প্রকাশ পেয়েছে তার আর কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, আমাদের অপিসের নবীনবাবু লোকটার অত্যন্ত অভাব। মনে ক'রেছে, এই শুভ-সংবাদ দিলে বড় দিনের সময় দু-পয়সা বক্‌সিস্ পাবে; এ তারই কাজ। অপিস

খুললেই তাকে বিদায় করতে হবে। এরা পয়সার জন্য পারে না এমন কাজই নেই।”

সরলা বলিল, “আজকাল কা’কে বিশ্বাস করবে বল? টাকাটাই এখন সব চেয়ে বড় হ’য়ে পড়েছে। নগেন বাবুর অত আস্ফালন কেন? লোকটা বোধ হয় কোন নেশা-ভাঙ্গ করে। আপনার মান নিজে রাখতে না পারলে, শেষে অপমান হবে। আচ্ছা! ঠাকুরপোর কোন চিঠি পেয়েছ?” যোগেশ বলিলেন, আজ সকালে তার চিঠি পেয়েছি, সে এখন বৃন্দাবনে আছে। আমাদের বড়দিনের ছুটীতে সেখানে আসতে লিখেছে, আরো লিখেছে এখানে এলে সত্যি সত্যি বিপুল আনন্দ পাবে। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছে, বলেছে, সে যতগুলি তীর্থ ভ্রমণ করেছে, সবচেয়ে এখানে যেন একটী মধুর উল্লাস, অনবরত মনের মধ্যে অজানা তৃপ্তির রসাস্বাদ করাইতে থাকে। ঠাকুরবাড়ীগুলির কি সুন্দর বর্ণনা করেছে! শেষে একটী জায়গায় লিখেছে, সেটা তার চিঠি থেকে পড়ে না শুনালে, আনন্দ পাবে না।” বলিয়া যোগেশ পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিলেন, বলিলেন “এই দেখ আমি লাল কালীর দাগ দিয়ে রেখেছি, আমার এত ভাল লেগেছে যে মনে হচ্ছে এই দণ্ডেই তার কাছে ছুটে যাই।”

সরলার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ একটী অনাবিল পুলকানন্দের সুধাধারা বহিতেছিল, সে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল

"কে বলে স্থান মাহাত্ম্য নেই? আমার এতটুকু বিশ্বাস ছিল না যে ঠাকুরপো আবার এত বড় চিঠি লিখে তোমার মন বৃন্দাবন যাবার জন্য টলাতে পারবে। কই, সেই জায়গাটা পড় না?"

যোগেশ লাল-কালীর দাগ-দেওয়া পত্রের সেই অংশটুকু পড়িতে আরম্ভ করিলেন "এখানে লালাবাবুর যে ঠাকুরবাড়ী আছে সেটী আমাকে সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এর চেয়ে ঐশ্বর্য্য-শালী শ্বেতমর্ম্মরে প্রস্তুত দেবালয় আরও আছে সত্য কিন্তু সে গুলিকে দেখিয়া কেবলই তীব্র গর্ব্বের ও প্রতিষ্ঠার অসহনীয় সমাবেশ বলিয়া মনকে সেই দিকেই টানিতে থাকে। গাধার চিনির বস্তা বহার মত, চিনির রসাস্বাদ করা যেমন কোন দিনই তার ভাগ্যে ঘটে না, এও ঠিক তাই। ঠাকুরের সন্ধান নেবার আগেই মনেরমধ্যে ঐশ্বর্য্যের নেশা এমন জমাট বাঁধতে থাকে, যে তার ঘোর কাটিয়ে চোখ চাওয়া একরূপ অসাধ্য। কিন্তু লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ীটী খুব সাধারণ। কেবল প্রাণের অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে যেন তার ভিত্ গাড়া হয়েছে। প্রত্যেক পাথরখানিই যেন লালাবাবুর আন্তরিকতায় স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগা-গোড়াই যেন মাধবের মধুরতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আরও বিশেষত্ব যে লালাবাবু নিজের দুয়ারে নিজেই ভিক্ষা করিয়া যেন ঐশ্বর্য্যের সমস্ত কলঙ্কটুকু দেবালয় হইতে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া লইয়াছেন। এখানে প্রীতি ও প্রেমের পরিণয়

ঘটিয়াছে। এত আনন্দ একা উপভোগ করা যায় না, তাই আমার অনুরোধ, বড়দিনের ছুটীটা এখানেই কাটিয়ে যাও।"

সরলা স্বপ্নাবিষ্টার মত শুনিতেছিল। তার হৃদয়ের মধ্যে এক সঙ্গে কত প্রকার ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিতেছিল, তাহা যেন সে নিজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। এই চিঠি খানি এমন কোন মন্ত্রশক্তিদ্বারা রচিত যে, ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ তর্ক বা মত প্রকাশ করা তাহার কল্পনার অতীত।

সরলা বলিল "আমারও ইচ্ছা হচ্ছে আজই যাই।" যোগেশ বলিলেন "আমি কেবল তোমার মতের অপেক্ষায় ছিলাম, এই দেখ টাইম-টেবিল কিনে এনেছি। সব গুছিয়ে নাও, কাল রওনা হওয়া যাবে।"

সরলা মহা আনন্দে যাবার আয়োজনে আপনাকে বিব্রতা করিয়া তুলিল।

যোগেশ বাহিরে যাবার নিমিত্ত কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইল।

১৩

খুব ভোরেই হরসুন্দর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখনও বৃন্দাবনের পথে সব দোকানপাঠ খোলে নাই। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস যেন তাঁহার ক্লিষ্ট শরীরের উপর জননীর করুণ করপল্লব বুলাইয়া দিল। পথের দুই ধারে ভিখারীরা সারি দিয়া বসিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে মর্কট-বাহিনী সমবেত হইতে সুরু করিয়াছে। নবাগত যাত্রীর দল বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে এই মহাশঙ্কাকুল বানর-বৃন্দের অভিনব আচরণ দেখিতেছেন। সকলেই যমুনা-স্নানে চলিয়াছেন। একটী সাত্বিক ভাবে যেন সমস্ত প্রকৃতিটী ভরিয়া রহিয়াছে। হরসুন্দরও তাঁহাদের সঙ্গে যমুনার দিকেই চলিলেন, কারণ এখানকার কোন পথই তাঁর জানা ছিল না।

নানাস্থান দেখিয়া তিনি বেলা প্রায় দশটার সময় বাসার দিকে ফিরিলেন। পথ ঠিক করিয়া বাসায় ফিরিতে, পথে তাঁহাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। এখানে প্রভাতে দেবালয়ে ঠাকুর-দর্শন হয় না, কারণ গোবিন্দজিউর নিদ্রা ভাঙ্গিতে বেলা দশটা বাজে। পথের মধ্যে একটী ভদ্রলোক অকস্মাৎ আসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "হরসুন্দর বাবু! আপনি এখানে কবে এলেন?"

হরসুন্দর দেখিলেন, ভদ্রলোকটীর পশ্চাতে একটী যুবতী অবগুণ্ঠন দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হরসুন্দর তাঁহাদের দেখিয়া এতদূর বিস্মিত হইয়াছিলেন যে অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন একটা অভাবনীয় চিন্তার মধ্যে পড়িয়া নির্ব্বিবাদে কোথায় ভাসিয়া যান ও এই ভাসিয়া যাইবার সমস্ত রস ও আনন্দটুকু যেমন এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া পরমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখেন—যেখানে ছিলেন ঠিক সেইখানেই আছেন ; সেই প্রকার হরসুন্দরের মনটী এক নিমেষের মধ্যে বিরহীর একটী বাংলার অপরিমেয় যত্ন ও আতিথ্যের রসাস্বাদ করিয়া যেমন চাহিলেন, দেখিলেন, তিনি বৃন্দাবনের পথে দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আমি কাল রাত্রিতে এখানে এসেছি। আপনারা কবে এলেন ? এদিকে যে আসবেন, তেমন আভাস ত কই একদিনও দেন নাই ?"

ভদ্রলোকটীর নাম বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ই, আই, রেলের ষ্টেসন-মাষ্টারী চাকরী করেন। উপস্থিত তিনি বিরহীতে বদলী হইয়াছেন। বিজয় বাবু লোকটী অত্যন্ত শাদাসিধে। কোন-রূপ হাঙ্গামা হুজ্জুত মোটেই পছন্দ করেন না। নিজের কাজটি সারিয়া বাসায় বসিয়া বই পড়েন। দুইখানি মাসিকপত্র নেন, সেগুলির প্রথম পাতা হইতে সুরু করিয়া, মলাটের বিজ্ঞাপনটা পর্য্যন্ত বাদ দেন না। অনেক দিন পর্য্যন্ত চোবের রান্না খাইয়া যখন আর আহারে মোটেই রুচি রহিল না, তখন অগত্যা বাধ্য

হইয়া এই সুদূর প্রবাসে তাঁহার স্ত্রী শৈলবালাকে আনিয়াছেন। উভয়ে উভয়ের সঙ্গী। কারণ এই পাহাড়-প্রদেশে বড় কেহ অবতরণ করেন না। ষ্টেসনটী খুব ছোট। তাঁহার বাসা এই ষ্টেসনসংলগ্ন, সুতরাং কাজ করিতে করিতে বাড়ীর খবর লওয়া যায়। এই সঙ্গীহীন স্থানে, তাঁহার ষ্টেসনে যদি কোন দিন, কোন বাঙ্গালীকে পান তবে দেবতার আদরে তাঁহার সেবা ও যত্ন করিয়া স্ত্রীপুরুষে অননুভূত তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করেন। সেজন্য ট্রেন আসিলেই তিনি প্রত্যেক গাড়ী খানির নিকট গিয়া দাঁড়ান, যদি কোন পরিচিত লোক পান বা কাহাকেও নামাইতে পারেন। তাঁহার স্ত্রী শৈল-বালার এইরূপ অতিথি সৎকারে বিশেষ আগ্রহ। হরসুন্দর যখন বৃন্দাবন দেখিতে আসেন, তখন তিনি বিরহীতে আসিয়াছিলেন এবং ইহাঁদের আতিথ্যের হাত কোন রকমে এড়াইতে না পারিয়া প্রায় ১৫ দিন এই প্রবাসীদের সংসারে অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের যত্ন ও সেবা এক মুহূর্ত্তের ভিতর তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠায় তিনি প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

বিজয়বাবু বলিলেন, "দু'মাসের ছুটী নিয়েছি। কি জানি, কখনও টাকা সংগ্রহ ক'রে আমাদের ভাগ্যে এসব তীর্থ হবে কি না তাই পাশ পাওনা ছিল, ছাড়ি কেন? এসে পড়লাম। সে যা হো'ক আপনি কোথায় উঠেছেন?"

হরসুন্দর এই পরিবারটীর সহিত সামান্য কয়েক দিনে এত ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে বিজয়বাবু তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। হরসুন্দর মনে মনে ভাবিলেন, মানুষের সব চেয়ে দুর্ব্বলতা হচ্ছে সেইখানে, যেখানকার অভাবটী তা'কে সর্ব্বদিক হইতে পূরণের আকাঙ্খায় দিবা রাত্রি পীড়ন করছে। এই অভাব ও পীড়ন যদি মানুষের মধ্যে অহরহঃ সমানে না চল্‌তো তা'হলে মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হ'তো! এই দুর্ব্বলতা যেখানে একটুখানি আশ্বাস পায় সেখানে সে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আপনাকে ধরা দিয়া সুখ পাইবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। পথের মাঝে হরসুন্দর এই প্রবাসী পরিবারের নিকট এমন একটা নিঃস্বার্থ স্নেহ ও প্রীতি পাইয়াছিলেন যে আপনাকে কত-খানি তাহাদের মধ্যে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে সম্পূর্ণ না বুঝিতে পারিলেও এই পরিবারটী অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিল। বিজয়বাবু বা তাঁর স্ত্রী শৈলবালার আচরণের মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা বা মৌখিক ভদ্রতার আবরণ ছিল না।

হরসুন্দর উত্তর করিলেন, "এই নিকটেই মাধবীকুঞ্জে উঠেছি।"

বিজয়বাবুর স্ত্রী ধীরে ধীরে বলিলেন "ওঁর বিছানাপত্র সব

আমাদের বাসায় নিয়ে চল, ওখানে নিশ্চয় ওঁর খাবার অসুবিধা হবে।”

বিজয়বাবু বলিলেন, “শুনছেন কি? হুকুম জারি হ’য়ে গেল আপনার ওখানে থাকা হবে না। আমাদের বাসায় যেতে হচ্ছে, চলুন একটা মুটে ক’রে সব নিয়ে আসি।”

এখানে হরসুন্দরের কোন আপত্তিই চলিল না। তিনি বলিলেন, “চলুন, আপনাদের বাসা দেখে আসি, বৈকালে তখন জিনিস পত্র নিয়ে গেলে চল্‌বে।”

বিজয় বলিলেন, “চলুন আপনার বাসা দেখে যাই, আপনাকে আর আস্‌তে হবে না, এক সময় আমি এসে নিয়ে যাব।”

তাহাই হইল—বিজয় বাসা দেখিয়া গেলেন। হরসুন্দর তাঁহাদের বাসায় গিয়া উঠিলেন। বৈকালে বিজয় আসিয়া হরসুন্দরের সমস্ত জিনিস পত্র লইয়া গেলেন। কুঞ্জস্বামিনী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন “কেন যাবেন, এখানে কোন অসুবিধা হবে না। ভদ্রলোক এসেছেন, আমরা কি তাঁরে যত্ন কর্‌ব না? আমরা তেমন লোক নই, কল্‌কাতা থেকে কত বড় বড় লোক এসে এখানে থেকে গেছেন। দেশে গিয়ে চিঠি দিয়েছেন—এখানে যেমন যত্ন পেয়েছেন, বাড়ীতেও তেমন যত্ন পান না।” বিজয় যখন কুঞ্জস্বামিনীর হাতে ঘরভাড়া বাবত দুইটী টাকা দিলেন তখন তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন “তাঁর যদি সেখানে এখানকার চেয়ে বেশী সুবিধা হয় তা’হলে আমার কোন

আপত্তি নেই—কি বল মা ললিতা?" ললিতা পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছিল, এবং মনে মনে ভাবিতেছিল, ইনি কে? কেনই বা তিনি চলিয়া যাইতেছেন আমরা এ বাড়ীতে আছি তা কি তিনি জানতে পেরেছেন? তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব? গত রাত্রে আমি যখন কুঞ্জস্বামিনীর অনুরোধে খাবার রাখ্‌তে যাই তখন ত আমি জান্‌তে পারি নাই যে তিনি এসেছেন, এবং তিনিও তখন নিদ্রিত। আজ কখন উঠে চলে গেছেন কেহই দেখে নাই।

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হয় ত কল্‌কাতা যাবেন, তাই জন্য চলে যাচ্ছেন, ওঁরা ত আর এখানে বাস করতে আসেন নি?"

কুঞ্জস্বামিনী বলিলেন, "তা সে কথা স্পষ্ট ক'রে বল্লেইত হয়; তা, বাবু কি আজই রওনা হবেন? সব দর্শন টর্শন হয়েছে কি?"

বিজয় বলিলেন, "না তিনি কলকাতা যাবেন না, এখানে দু'মাস থাকবেন, আমাদের আপনার লোক। নিকটে থাকলে কোন কষ্ট হবে না—সেই জন্যই যাওয়া, ভাল কথা, যদি পাণ্ডা ঠাকুর আসেন তাহ'লে তাঁকে বলে দেবেন যে আমরা নিধুবনের কাছে সাধন কুঞ্জে আছি। সেখানে যেন যান", বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ললিতার মনের মধ্যে একটা মহা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। আমাদের জন্যই কি তিনি এখান হ'তে যেতে বাধ্য হ'লেন?

হঠাৎ তিনিই বা বৃন্দাবনে এলেন কেন? অনেকদিন ললিতার সহিত হরসুন্দরের দেখা হয় নাই। এই কয়বৎসরে হরসুন্দরের শরীর যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা গত রজনীতেই ললিতা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং এরূপ হবার কারণ তাহার অজানা ছিল না। আমরা এখানে আছি নিশ্চয়ই তিনি জানেন না, তা'হলে খুব সত্যি তিনি জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা করতেন। ললিতার কেবলই মনে হইতেছিল জ্যেঠাইমা পূজা করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখনি সাধন কুঞ্জে গিয়া হরসুন্দরকে ফিরাইয়া আনে? সেখানে তাঁহার কে আত্মীয় আছেন? জ্যেঠাইমা গেলে, দেখা যাবে, তিনি কত বড় আত্মীয় যে তাঁকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারেন? জ্যেঠাইমা স্নান করিয়া আসিয়া ডাকি-লেন "ললিতা, এই ফুলগুলি তুলে রাখ্‌ত মা? আজ ঠাকুর-বাড়ীতে দেখ্‌লাম, অনেক যাত্রী, ভাব্‌লাম, বুঝি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে, কই তা হ'লো না।"

এই সময় ললিতার সমস্ত অন্তরটা যেন আকুল আগ্রহে বলিতে চাহিতেছিল "হ্যাঁ জ্যেঠাইমা চেনা লোক ত এসেছেন, তোমারই কাছে এসে ফিরে গেছেন? ললিতার অন্তরের কথা ললিতার অধরপ্রান্তেই মিলাইয়া গেল. একটা অতীতের দিনের কোন্ লজ্জা, আজ অকস্মাৎ সাজ-সজ্জা করিয়া ললিতার কণ্ঠ অকরুণ ভাবে চাপিয়া ধরিল। সহসা পথিক যেমন দস্যু হস্তে পতিত হইয়া চীৎকার করিবার অবসর টুকু না পাইয়া কেবল শূন্য

দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, ললিতার কথা আজ লজ্জার নিকট তেমনই নির্দ্দয়ভাবে লুণ্ঠিত হইল। বাধা দিবার মত কোন শক্তিই তাহার আসিল না। দান করিবার মত অন্তর দিয়া নিঃস্ব করিয়া বিধাতা মানুষকে যেমন ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত করেন, তেমনই একটা হৃদয় লইয়া দারিদ্রপীড়িতের কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করার মধ্যে যে হৃদয় কতখানি ক্ষতবিক্ষত হয়, তা' যেমন বাহিরে প্রকাশ করার মত ভাষা নাই, এবং সেই প্রতিকারে অনন্যোপায় অবস্থাটা যে মানুষের বিশ্বব্যাপী অভিশাপ ব'লে মনে হয়, তা কেবল সেই মানুষটীই অনুভব করতে পারে, অপরে তার আভাষ টুকু পর্য্যন্ত পায় না। আজ ললিতার হৃদয়ও তেমনই আঘাতে যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। ললিতার দুই নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। জ্যেঠাইমার কথায় সে যেন সবদিনের মত আগ্রহের সহিত যোগ দিতে পারিল না।

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "ললিতা মনে করছি এই সময় একবার রাধা-কুণ্ডু শ্যাম-কুণ্ডু দেখে আসি, সেখানে দিন কতক থাকবও মনে করছি, কি বলিস্?"

এ প্রস্তাব ললিতার মনটাকে আরও উতলা করিয়া দিল সে বলিল, তোমার শরীরটা ভাল নয় বলছিলে—একটু সেরে গেলে হ'তো না?"

তবে তাই হবে। মহামায়া দেখিলেন ললিতার মন যেন আজ একটা কিসের চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

১৪

দ্বিতলের একখানি বেশ প্রশস্ত কক্ষের মধ্যে একটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শয্যা। শয্যার পার্শ্বে একটী ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্কের উপর একরাশ কেতাব। সে গুলিও বেশ শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত। শয্যার অপর পার্শ্বে একটী চামড়ার ব্যাগ, সেটী বস্ত্রাদি পরিপূর্ণ থাকায় ফুট বলের মত ফুলিয়া রহিয়াছে। অদূরে একটী বাতিদান; তাহাতে বাতিটী সারারাত্রি দগ্ধ হইয়া নিঃশেষপ্রায় অবস্থায় ছিল। বিছানার উপর একখানি সদ্য সমাগত 'মানসী', তাহার মোড়ক এখনও কেহ ছিন্ন করে নাই। তা'র উপর কয়েক খানি পত্রও রহিয়াছে। হরসুন্দর বেড়াইয়া আসিয়া বিছানার উপর হইতে চিঠিগুলি লইয়া একে একে পড়িলেন। তারপর বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া 'মানসীর' মোড়ক খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; এবং বিজ্ঞাপনের প্রথম পাতা হইতে সুরু করিয়া শেষ পাতা পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া লইলেন। এই শয্যার উপর শৈলবালা একখানি রেকাবিতে কিছু ফল ও ক্ষীরের খাবার এবং এক পেয়ালা চা রাখিয়া বলিল "দাদা জল খাও, আজ তোমার চা খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। তারপর শৈলবালার দৃষ্টি 'মানসীর' উপর পড়িলে আগ্রহ সহকারে বলিল "এই যে মানসী এসেছে, এবার দেরী হয়ে গেছে না দাদা?"

হরসুন্দর বলিলেন, "হ্যাঁ শৈল। অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়েছিলাম, এক জায়গায়, একজন বড়মানুষ মাড়োয়ারী প্রায় পাঁচশো বাঁদরকে 'পুরী' মেঠাই খাওয়াচ্ছে, তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু এটা দেখ্‌বার জিনিস্।"

শৈলবালা বলিল, "আগে চা টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। আমি মনে কর্‌লাম বুঝি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে আর দাদা গল্প জুড়ে দিয়েছে!"

হরসুন্দর তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটী তুলিয়া লইয়া এক চুমুক খাইয়া বলিলেন, "হ্যা শৈল, তুই বুঝি তোর দাদাকে কেবল গল্প কর্‌তে দেখিস্।"

শৈলবালার মনটী এই সকরুণ আহ্বানে ও অভিযোগে স্নেহার্দ্র হইয়া গেল। তাহার অন্তরের মধ্যে ছোট বোনের আদর ও উল্লাস এক সঙ্গে এক অপূর্ব্বভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহার নয়নদুইটী সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, সে হরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তোমাকে গল্প কর্‌তে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।"

হরসুন্দর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শৈল তুই কি এখন "মানসী" পড়্‌বি? তুই বোধ হয় বাঁদরদের নিমন্ত্রণ দেখিস্ নি, খুব সুন্দর, ঠিক মানুষের মত সার দিয়ে বসেছে, একটু খানি গোলমাল নাই, সাত আটজন পাণ্ডা 'পুরীর' ঝোড়া

নিয়ে রীতিমত পরের পর পরিবেশন করে যাচ্ছে। বৃন্দাবনের এটা একটা দেখ্‌বার জিনিস।"

শৈলবালা উত্তর করিল, "অনেকের মুখে গল্প শুনেছি, কিন্তু কখন দেখিনি।"

হরসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আরো মজার ব্যাপার আছে, সব ছেলে পুলেদের কেমন সাম্‌লে নিয়ে বসেছে। এবার তোকে একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌বো।"

শৈলবালা বলিল, "আজ বুঝি গেলে আর হয় না?"

হরসুন্দর বলিলেন, এতক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে। হ্যাঁরে, কতগুলা বই আস্‌বার কথা ছিল, আসেনি দেখ্‌ছি, চিঠি পেলাম, বই পাঠিয়েছে, কিন্তু কেন এলো না কে জানে?"

আজ প্রায় এক মাস হইল হরসুন্দর এখানে আসিয়াছেন; শৈলবালা ঠিক তাঁর ছোট বোনের মত হইয়া গিয়াছে। অনেকখানি স্নেহ শৈলবালা অধিকার করিয়াছে, এবং হরসুন্দরও পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা তৃপ্তির আস্বাদ পাইয়াছে।

হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, আজ বিজয়বাবু কোথায় রে? তাঁর যে সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, বেরিয়েছেন, বুঝি?"

শৈলবালা বলিল, "কেন, তোমার সঙ্গে সকালে দেখা হয় নাই? তিনি আজ সেই জ্যোতিষি ঠাকুরকে ডাকৃতে গেছেন।"

হরসুন্দর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হচ্ছিল

তপস্যার ফল

অদৃষ্ট কি দেখা যায়? ভবিষ্যতের কথা কি বল্‌তে পারে? মানুষের বুদ্ধি কি মানুষের অজ্ঞেয় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারে? তা যদি পারত, তবে জীবনের পথে এত দুঃখ কষ্ট থাকবে কেমন ক'রে? সম্মুখে বিপদ আস্‌ছে জান্‌তে পারলে কি, সে সেদিকে আর পা বাড়ায়? এমন অনেক ঘটনার হাত হ'তে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, এবং অপরকে রক্ষা করবারও সময় পায়—কি জানি এ সব যেন প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়। হরসুন্দরের মনে হচ্ছিল যে একবার তার নিজের অদৃষ্ট গুণাইলে হয় না? এরূপ চিন্তায় তাহার বড় হাসি পাইল, ভাবিলেন, দেখ কি দুর্ব্বলতা, যা জানা যায় না, মানুষের তা জানবার প্রবৃত্তিই ষোল আনা। বিরুদ্ধশক্তিকে আঘাত দেওয়াই হচ্ছে স্বভাবের স্বাভাবিক নিয়ম। যেটা জান্‌তে নেই, সেটা জান্‌বার জন্য একটা তীব্র নেশা মানুষের অজ্ঞাতসারে তার মনকে আপন দখলে নিয়ে আসে, পরে তাকে দিয়ে সব সইয়ে নেয়। যখনই মানুষ আপন শক্তি প্রয়োগ ক'রে কিছুই বুঝ্‌তে পারে না, তখনই অনন্যোপায় হ'য়ে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পায়। এই অদৃষ্টই দুর্ব্বল মানুষকে তার দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, নইলে তার সাধ্য কি যে এত কাতরতা ও হতাশ্বাসের মধ্যেও সে আশ্বাসের মোহিনী মূর্ত্তির মায়াজাল বুনে আপনাকে জড়িয়ে রাখে। বিধাতার এই

অপূর্ব্ব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা কতদূর সম্ভবপর তা' ঠিক বোঝা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। শৈলবালা নীরবে হরসুন্দরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কি একটা অসহ্য অব্যক্ত বেদনা যেন হরসুন্দর প্রাণপণ শক্তিতে অহোরাত্র ভোগ করছেন, এবং বাহিরে তার কোন চিহ্ন না থাকলেও মাঝে মাঝে যেন তিনি কেমন অসম্ভবরকমে গম্ভীর ও উদাস হয়ে পড়েন। তিনি যে একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক এটা কিছুতেই বলা যায় না, তবে যখন একটা অসম্ভব প্রেমের তরঙ্গ তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করে তখনই সেই ভাবটীকে যেন আয়ত্ত করতে গিয়ে তিনি সময়ে সময়ে গম্ভীর হয়ে পড়েন। এমন খাঁটী সত্যিকার মানুষ খুব কম দেখা যায়, শৈলবালা হরসুন্দরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া শৈল ডাকিল "দাদা কই 'মানসী' পড়্লে না? শরীরটা কি অসুস্থ মনে কর্‌ছ?" হরসুন্দর যেন চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু চকিতে সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "না রে, আমার কোন অসুখ করে নি। তুই বুঝি তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছিস্, আমি মনে কর্‌লাম তুই চলে গিয়েছিস্।"

শৈলবালা অত্যন্ত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "দাদা খানকতক পাঁপর ভেজে দেব, তুমি ত পাঁপর খেতে ভালবাস?"

হরসুন্দর বলিলেন, "তা আন্, তোর কোন কথায় ত না বল্‌তে পার্‌ব না।"

শৈলবালা তাড়াতাড়ি পাঁপর ভাজিয়া আনিতে চলিয়া গেল। হরসুন্দর এই পথে-পাওয়া-বোনটীর বিষয় কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর 'মানসী' খানি পড়িতে বৃথা প্রয়াস পাইলেন। সেখানি রাখিয়া দিয়া বাতায়নের নিকট উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দূরে যমুনা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, ও মনে মনে বলিলেন, আমার জীবনটা যেন উপন্যাস।

অল্পক্ষণ পরে শৈল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, হরসুন্দর জানালার নিকট দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক হইয়া অনিমেষনয়নে কি যেন দেখিতেছেন। শৈল মৌন ভঙ্গ করিয়া স্নেহবিজড়িতকণ্ঠে ডাকিল "দাদা?"

হরসুন্দর চমকিয়া ফিরিয়া বলিলেন, "কিরে, আমাকে কিছু বল্‌ছিস্?"

"হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম, তুমি রান্নাঘরে বস্‌বে এসো, সেখানে গরম গরম ভেজে দেবো। পাঁপর এতদূর ভেজে আন্‌তে ঠাণ্ডা ও নরম হ'য়ে যাবে। খেতে ভাল লাগ্‌বে না।"

হরসুন্দর মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন এতখানি স্নেহের আহ্বান তিনি যে খুব কম পেয়েছেন, এত বড় একটা লোকসান যে তাঁর জীবনের মধ্যে এতদিন সুদে-আসলে কত বড় হ'য়ে উঠেছে, আজ যেন তিনি সমস্ত মন, সকল আস্বাদ ও দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাহাই অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন। অকস্মাৎ তাঁহার

মনে হ'লো সকল মানুষের মধ্যেই একই রক্ত, একই প্রাণ, একই অনুভূতি অব্যাহত গতিতেই চলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তির মূল কারণ সেই একই অনুভূতি। তাই মানুষের যখন ঠিক সত্যাদিকটি যে কোন একটী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সকল মানুষের সেই ভাবটী এক হ'য়ে পড়ে। তা' যদি না হ'তো, তা'হলে কোন ভাবই অনুভূতির মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখ্‌তে পার্‌ত না এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রসাস্বাদ কর্‌তেও মানুষ পার্‌ত না। আসিবার দিনে রমেশের বাড়ীতে তার স্ত্রীর মৌন স্নেহ যত্ন হরসুন্দরের অন্তরের মধ্যে যে প্রীতির ভাবটী জাগাইয়া দিয়াছিল, আজ এই অব্যাহত অকুণ্ঠিত স্নেহ ও যত্নের ভাবটীও যে সেই একজাতীয় এবং উভয়ের অনুভূতি যে একই প্রকার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ উভয়ের মধ্যে তফাৎ কেবল ততটুকু যতটুকু সূর্য্যের উত্তাপ সূর্য্যের দূর এবং কাছের দেশ পেয়ে থাকে।

শৈল ডাকিল, "এসো না দাদা, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি যে কি এত মাথা-মুণ্ডু ভাব বুঝ্‌তে পারি না।"

হরসুন্দর মনে মনে ভাবিলেন, কেন যে তিনি এত ভাবেন, তার উত্তর যদি শৈলের জানা থাক্‌ত, তবে হয় ত সে এ প্রশ্ন মোটেই কর্‌ত না।

হরসুন্দর বলিলেন, "হ্যারে বিজয়বাবু এসেছেন? চল্ আবার দেরি হ'লে তুই রাগ্ করবি।"

শৈল বলিল, "না, তিনি এখনও আসেন নি, হয় ত জ্যোতিষীর জন্য তাঁর বাসায় বসে আছেন।" রান্নাঘরের একপাশে শৈল একখানি কুশাসনের আসন পাতিয়া দিল। হরসুন্দর তাহার উপর বসিয়াই বলিলেন, "তুই যে ঠিক আমাকে বামুন ক'রে দিলি দেখ্ছি।

শৈল একগাল হাসিয়া বলিল, "কেন, শৈলের দাদা কি বামুন নয়?"

তারপর একখানি একখানি করিয়া পাঁপর ভাজিয়া দিতে লাগিল, আর হরসুন্দর কত দেশের গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিলেন।

শৈল অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "দাদা, এবার কিন্তু কলিকাতা গিয়া আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। আমি কখন চিড়িয়াখানা দেখি নি, বৌ-দিদিকে সঙ্গে নিয়ে দেখে আস্ব। দাদা তুমি শুন্ছ না, কি ভাবছ?"

হরসুন্দর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর তোর বৌ-দিদি যদি তোকে নিয়ে যেতে মানা ক'রে দেয়?"

শৈল বলিল, "ইঃ, তা আর হতে হয় না, আমার দাদাকে ত আমার জান্তে বাকি নেই, তুমি নিয়ে যাবে না, তাই বল।"

হরসুন্দর এমন একটা মিথ্যা কল্পনা মনের মধ্যে স্থান

দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় মনে করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোকে চিড়িয়াখানা নিশ্চয় দেখাব জানিস্।"

এই সময় বাহির হইতে কে দরজার কড়া নাড়িল। শৈল বলিল, "ঐ তিনি এসেছেন; দাদা, তুমি যেন উঠে প'ড়'না।" হরসুন্দরকে বসাইয়া শৈল দরজা খুলিয়া দিতে গেল। হরসুন্দর মনে করিলেন, তিনি যেন শৈলের নিকট প্রবঞ্চনা করছেন। সে যেন মনে মনে কি একটা অদ্ভুত কল্পনা ক'রে বসে আছে। এটা কিন্তু কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। ওকেই বা সব কথা কি ক'রে খুলে বলি। এ যেন মিথ্যা নিয়ে মস্ত একটা অভিনয় করা হচ্ছে।"

শৈল রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কড়া চড়াইয়া দিল। বিজয়বাবু বলিলেন, "হরসুন্দর বাবু পাঁপর ভাজা খুব ভালবাসেন না? আজ আমি খুব ভাল পাঁপর এনেছি।"

"হরসুন্দর বলিলেন, "আপনার জ্যোতিষী ঠাকুরের কি হলো?"

"তিনি ত এসেছেন, উপরে অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

হরসুন্দর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "চলুন, তার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক্।"

উভয়ে উপরে আসিয়া জ্যোতিষীর নিকট উপবেশন করিলে জ্যোতিষী তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিজয় বলিলেন, সে আজ তিন বৎসরের কথা, আপনার

সঙ্গে দেখা, তখন আমি মৃজাপুরে থাকি, আপনি বিন্ধাচল গিয়াছিলেন।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হাঁা বাবা, খুব মনে আছে—তখন কি আমি তোমার হাত দেখেছিলাম ?"

বিজয় বলিলেন, "আপনি দেখেছিলেন, এবং যে কথা বলেছিলেন, একে একে সব মিলে গেছে। পিতা মাতা উভয়েরই এক বৎসরের মধ্যে স্বর্গলাভ হয়েছে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "বটে, খুব মিল হ'য়েছে ত ? মনের গতি যদি ঠিক থাকে, তবে অনেকসময়ে গণনা ঠিক হয়, সবই ত হিসাবের কাজ বাবা।"

বিজয় বলিলেন, "আজ এখানে আপনার দর্শন পাব এমন আশা করি নি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আন্তরিক আগ্রহ কোন দিনই তিনি কাহারও অপূর্ণ রাখেন না। যিনি নিজে পূর্ণ তিনি যে বাবা কিছুই অপূর্ণ থাকৃতে দেন না। তোমার ইচ্ছা হ'য়েছে যখন, তখন আমার সাধ্য কি যে এক পা নড়ি। আমরা হচ্ছি লাটাইয়ে-বাঁধা-ঘুড়ী, সূতা যত আল্‌গা দেন, আমরাও ততই মেঘের কাছে গিয়ে উড়ি, ভাবি আমাদেরই ক্ষমতা—কিন্তু যখন লাটাইয়ের মালিক ইচ্ছা ক'রে নদীতে বা পাহাড়ে ফেলে দেন, তখন পড়াই হচ্ছে আমাদের ভাগ্য ভিন্ন আর কি বল্‌ব বাবা ?

আবার লাটাইওয়ালার খেয়াল হ'লে কর্ম্মসূত্র যতই গুটিয়ে আন্তে থাকেন, ততই কাছে টেনে নেন।”

হরসুন্দর এতক্ষণ মনোযোগসহকারে ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। জ্যোতিষী যে কেবল ব্যবসায়ী বা সাধারণ গণৎকার—এমন ভ্রমটা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। তিনি জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি যে কথা বল্লেন, তার শাদা অর্থ হচ্ছে, আমাদের কোন হাত নাই, যেমন চালাবেন, তেমনি চল্তে হবে—তাহ'লে এই জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে আমাদের অদৃষ্টের যে একটা ভবিষ্যৎ জান্তে চেষ্টা করি, সেটার কিন্তু কোন অর্থ বা মূল্য নাই—তাঁর খেয়ালের উপর ভবিষ্যতের ভাগ্য নির্ভর করছে—এই ত আপনার কথার মোটামুটি ব্যাখ্যা ?”

জ্যোতিষী স্থিরদৃষ্টিতে হরসুন্দরের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, বলিলেন, “মোটামুটি কেন বাবা, শাদাসিধে কথাই হচ্ছে ঐ—কিন্তু এর মাঝে তিনি সমানভাবে মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু নিজ নিজ বিবেক যদি মানুষ হারায়, তবে তার জন্য যে স্বাভাবিক ধাক্কাটা লাগে, তা ত মানুষের নিজের আচরিত কর্ম্মেরই ফল, এবং এই কর্ম্মফলই তাঁর খেয়ালের মাত্রাকে কেবল বাড়িয়ে তোলে। জ্যোতিষশাস্ত্র নূতন কিছু গড়্তে পারে না, তবে যেটা গড়া আছে, সেইটারই খবর দেয়, সেজন্য যেটা হবে সেটাকে কোনদিনই জ্যোতিষ নড়িয়ে দেবার মত সাধ্য বা স্পর্দ্ধা করতে পারে না। রেলগাড়ী ছাড়্বার

একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রেলের কর্ত্তা ঠিক ক'রে দিয়েছেন, ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী আস্‌ছে ও যাচ্ছে, কিন্তু তথাপি কত লোক ষ্টেশনে এসে গাড়ী ফেল হ'চ্ছে ; এজন্য হয়ত সারারাত্রি অনাহারে, অনিদ্রায়, মশার কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ে। এর কারণ কি ? হয়ত, তাহার টাইম-টেবেল নাই বা পড়িবার মত বিদ্যাও অভ্যাস করে নাই। টাইম-টেবেলই হ'চ্ছে অদৃষ্টের জ্যোতিষশাস্ত্র। রেলের কর্ত্তার ইচ্ছায় গাড়ী যাবে, আস্‌বে ও থাম্‌বে, কিন্তু তোমাকে সেই যাওয়া আসা ও থামার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হ'লে বিবেকরূপ বুদ্ধি দিয়ে—টাইম-টেবেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করতে হবে, নইলে পদে পদে ঠক্‌তে হবে। এতে রেলকর্ত্তার কোন দোষ নাই। জ্যোতিষ তোমার যাওয়া আসার ও উঠা নামার সময় নির্দ্দেশ ক'রে দেয়। টাইম-টেবেল দেখে চল্‌লে যেমন গাড়ী ফেল হবার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি জ্যোতিষ দিয়ে জীবনের গতিটা জেনে নিয়ে কাজ করলে দু-ঘণ্টা আগে গিয়ে ষ্টেশনে বসে থাক্‌তে হয় না বা হতাশ হবার কারণও থাকে না। জ্যোতিষ ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টা বলে দিতে পারে। রেলগাড়ী কখন কোথায় কি ভাবে ছাড়ে এটা যেমন টাইম-টেবেল না দেখা পর্য্যন্ত অদৃষ্ট থাকে, তেমনি মানুষের জীবন-যাত্রার টাইম-টেবেলও জ্যোতিষ না দেখা পর্য্যন্ত অদৃষ্ট থাকে। সবাই যে আবার টাইম-টেবেল দেখ্‌তে জানেন, তা নয়—যাঁরা জানেন,

তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাঁরা এক মিনিটের ভুল করলেই চব্বিশ ঘণ্টার ফেরে পড়িয়া লোকটা নাকাল হ'য়ে নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু সে যদি ভাল লোকের দ্বারা টাইম-টেবেল দেখিয়ে রাখ্‌ত, তা'হলে এতটা কষ্ট ভোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারত।"

হরসুন্দর বলিলেন, "আপনার যুক্তিটা আমার বেশ মনে লেগেছে—একথা খুব সত্যি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "এখন কথা হচ্ছে—যা'কে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে গাড়ী ফেল হ'য়ে টাইম-টেবেলের উপর রাগ করে যদি বলেন, ওসব কিছু নয়, কিছু মেলে না, তা'হলে সে কথার কোন উত্তর নাই।"

শৈল কবাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল, কিন্তু এ সব তর্ক মোটেই তার মন আকর্ষণ করিতেছিল না।

জ্যোতিষী বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে এই বাবুটার হাত দেখি।" তারপর হরসুন্দরের দিকে প্রসন্ন আননে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি কোন আপত্তি আছে?"

তিনি এমন মধুর ও অসঙ্কোচভাবে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিলেন যে, হরসুন্দর কোনরূপ আপত্তি করিতে সাহস পাইলেন না।

হরসুন্দর কলের পুতুলের মত বলিলেন, "না।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "বাবা, একটু এই আলোর দিকে এগিয়ে এসো ত ? অনেক পাশ্‌টাস্‌ও করেছ দেখছি, এসব 'গণনা-টননা' কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও পাগলামি এমনই একটা অন্ধবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে—না ? সব জিনিষ ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌লে অনেক সময়ে বিশেষ ক্ষতি হয়" বলিয়া হরসুন্দরের হাতখানি দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার হাত দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি—এমনি জোরে একমাত্র সত্যকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে পড়ে থাক, সত্যই তোমার তপস্যার ফল এনে দেবে। কিন্তু বাবা টাইম-টেবেল না দেখার জন্য সারা জীবন গাড়ী ফেল হ'য়ে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ।"

হরসুন্দর বলিলেন, "আর কিছু দেখ্‌লেন ? গাড়ী ধ'রবার উপায় আছে ?"

"দেখ্‌লাম বইকি বাবা, মৃগ নিজ নাভির গন্ধেই ছুটে মরছে, কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না, কোথা থেকে গন্ধ আস্‌ছে।"

হরসুন্দর অত্যন্ত বেদনাকাতর কণ্ঠে বলিলেন, "তবে কি কেবল সে ছুটেই তার জীবনটা শেষ করবে ? এই কি বিধাতার নিয়ম ?"

জ্যোতিষী একটু হাসিয়া বলিলেন, "টাইম-টেবেল দেখ্‌লে বেশ বোধ হয় মাঝে মাঝে দাঁড়াবার স্থানে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রামও করতে পারে। এই বিশ্রাম করার নাম হচ্ছে সংসার

করা—তা ত তোমার সাম্‌নেই উপস্থিত। একমাত্র সত্যই সত্যকে জয় কর্‌তে পারে, আর কেহ পারে না।

হরসুন্দর দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আপনার কথায় মনে হচ্ছে, সংসার করাটা খুবই সাম্‌নে এগিয়ে এসেছে, কেমন?"

জ্যোতিষী তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যে এটাকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে ক'রে মনে মনে খুব হাস্‌ছ, তা' আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু আমি যতদূর টাইম-টেবেল দেখ্‌লাম, তাতে ক'রে খুব জোরের সহিত বল্‌ছি দুই তিন দিনের ভিতর এর সূচনা হ'বে। যা তুমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাব নাই, তাই তোমাকে করতে হবে। অনেকটা গাড়ী উল্টে যাওয়ার মত।"

হরসুন্দর আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। জ্যোতিষী বলিলেন, "তোমার মনের জোর খুব আছে, সত্যই তোমাকে সত্য পথে নিয়ে যাবে বাবা, আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হ'ক। এ সংসারের অবিশ্বাস করার মত ঢের জিনিষ আছে, আবার বিশ্বাস করার মত এমন অনেক জিনিস আছে, যা' দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাস আপনি ধরা দেয়।"

বিজয় নির্ব্বাক হইয়া এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, কোন প্রশ্নই করেন নাই, তাঁহার নিকট সকল কথাই যেন একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতেছিল।

জ্যোতিষী বলিলেন, "দেখ বাবা! যতক্ষণ না সব জিনিসের ভেতরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, ততক্ষণ বাহিরের আবরণটা নিয়ে কেবল টানা হিঁচড়া ক'রে কষ্ট ডেকে আনে। উপরকার আবরণটার সঙ্গে কেবল বাহিরের আলাপ, বাহির দেখে দুর্গের অভ্যন্তরের কোন খবরই পাওয়া যায় না, গেলেও ভুল হয়।" তারপর বিজয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আসি, পরশু এসে তোমাদেরও হাত দেখ্‌ব।" সকলে জ্যোতিষীকে প্রণাম করিলেন। হর সুন্দরের মনের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩

আজ শনিবার বেলা ৫ টার পর নগেন পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে একটী ছড়ি হাতে বাবু সাজিয়াছে। সে একখানি থার্ড-ক্লাশ ছ্যাকৃড়া গাড়ী হইতে হরিপদ্দনের গলির কোন একটী দ্বিতলবাড়ীর দরজার সম্মুখে নামিল এবং গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিতেই একটী বিগতযৌবনা স্ত্রীলোক বলিল, "এতক্ষণ ভাব্‌ছিলাম, বুঝি শনিবারটা ফাঁক যায়। তোমার গিন্নী যে তোমার জন্য সাজ গোছ ক'রে বসে আছে। আজ ত দিব্বি বাবু সেজে এসেছ, রাত্রে প্রসাদটা আস্‌টা প'াব কি ? সে দিনত নেমন্তন্ন ক'রে ফাঁকি দিয়েছ।" নগেন উত্তরে একগাল হাসিয়া "তা আর পাবে না—বিবি সাহেব" বলিয়া নিজের বক্ষের উপরের পকেট্‌টী চাপড়াইয়া বুঝাইয়া দিল যে আজ তার কাছে অনেক টাকা আছে। রমণী নামিতে নামিতে বলিল, "দেখ ভাই শেষে যেন ফাঁকে না পড়ি, তোমার গিন্নীর যে আঁট্‌, পরকে এক গ্রাস দিতে হ'লেই তার বুক ফেটে যায়।"

নগেন উপরের ঘরে গিয়া দেখিল গিরিবালা আয়নার সম্মুখে বসিয়া বেশবিন্যাস করিতেছে এবং একটা ফিতা দাঁত দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং নগেনকে

অভ্যর্থনা করিবার কোনরূপ সুযোগ পাইল না। কেবলমাত্র তাহার অধরপ্রান্তে অতি কষ্টে একটু খানি হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল। তাহাতেই নগেনের অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। সে নির্ব্বাক হইয়া গিরিবালার বর্ত্তমান অবস্থাটীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল। চাদরখানি ও ছড়িটী আল্‌নার উপরে রাখিয়া সে নীচের বিছানায় সটান হাত পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল এবং বলিল, "রাণি! এত দিনে কার্য্য সিদ্ধির পথ সাফ হ'য়ে এসেছে। তুমি আমায় যতই বোকা বল না কেন, আজ বাবা কি মতলব যে খাটিয়েছি তা শু'নে হুম্‌দো হুম্‌দো এটর্ণী গুলো তুশো তারিফ্ ক'রেছে। একজন বল্লে, তুমি যদি বাবা উকীল হ'তে তা'হলে সমস্ত মক্কেল মৌমাছির মত তোমার মধুচক্রে আট্‌কে যেত।"

একথার উত্তরে গিরিবালা কোন কথাই কহিতে পারিল না, কারণ উত্তর দিবার মত অবস্থা তখনও তাহার আসে নাই। নগেন গিরিবালাকে আদর করিয়া 'গিরিরাণী' বলিয়া ডাকিত, কিন্তু অবশেষে সম্বোধনটী 'গিরি' ছাড়িয়া কেবল 'রাণী'তেই পরিণত হইয়াছিল। নগেন গিরিবালার নিকট হইতে কোন উৎসাহ না পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইল এবং অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে বলিল, "তুমি কি চুল বাঁধ্‌বার আর সময় পেলে না? সারাদিন কি কাজে ব্যস্ত থাক যাদু।"

এবার গিরিবালা রাগিয়া বলিল, "তোমার মত আক্কেল

হ'লে ভোরে উঠেই চুলটা বেঁধে রাখ্‌লেই ভাল হয়। ঘুমাবার সময় নাইবার ব্যবস্থাটা কর্‌লেই তুমি খুব খুসি হও, নয়? আঃ কপাল, ওঁর জন্য দুপুর বেলা থেকে চুল বেঁধে বোসে থাকি। কি আমার নশো-পঞ্চাশ-টাকার বাবু রে? দেবার বেলা সিকি পয়স আর তম্বির বেলা লাখ্‌ টাকা। বিষ নেই কুলো পানা চক্কর।"

অঙ্কুশআহত হস্তী যেমন এক নিমেষের মধ্যে তাহার অবাধ্যতা ত্যাগ করে, তেমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে নগেন বাবুর সমস্ত উৎসাহ বারিনিপতিতবহ্নিরন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তার এতটা আয়োজন যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই অকস্মাৎ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে বাধ্য হইল। সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও তাহা প্রকাশ করিববার মত সাহস এখানে তাহার কুলাইত না, সে আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া সম্মুখের বারান্দায় গিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল।

নীচের উঠানে একপাশে এক রাস হাঁসের ডিমের খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। একধারে রক্তবর্ণ কাঁকড়ার দাড়াগুলি ভগ্ন-দন্তের ন্যায় একটা বীভৎস কাণ্ডের অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল। বারান্দার অপর পার্শ্বে রেলিংয়ের উপর দশ পনের থানি বিচিত্র বর্ণের কাপড় শুথাইতেছিল। একটা ঘোরতর তাণ্ডবনৃত্যের বিপুল আয়োজন যেন মহাসমারোহে চলিবে, তাহারই পূর্ব্ব সূচনা করিতেছিল। তখন সবেমাত্র দু-

একটী বাবু আসিয়া এক একটী ঘর অধিকার করিতেছিল। কোন ঘরে সন্ধ্যা-সমাগম-প্রতীক্ষায়-অধীর বাবুগণ 'হারমণিয়মের' বক্ষপঞ্জর টিপিয়া উৎকট বেদনার হাস্যকরুণ সুর বাহির করিতেছিল। ইতিমধ্যে গিরিবালা সাজ-সজ্জা সারিয়া পশ্চাৎ হইতে নগেনবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ছিঃ ভাই! রাগ্ করতে আছে?" এই আহ্বানে নগেনের হৃদয়টী গলিয়া গেল। সে সুবোধ বালকের মত সুড়্সুড়্ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। গিরিবালা তাহার পার্শ্বে গায়ে গা ঠেকাইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিল, এবং একটী পান তাহার মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "এখন বল তোমার বুদ্ধির কথাটা। হরসুন্দর বাবুর উইলখানা বা'র করেছ বুঝি?"

নগেন উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "এটর্ণীরা বাবা দু'শো তারিফ্ করেছে, আর তুমি কিনা, এক কথায় আমার সেই বুদ্ধির নাগাল্ পেতে চাও। তা হ'লে তুমি গাউন পরে এটর্ণী সেজে বেরোও না বাবা। এটাতো আর নতুন নয়। মেয়েমানুষ ব্যারিষ্টার আছে—আর এটর্ণী হ'তে পারে না?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি, মেয়ে মানুষ আবার ব্যারিষ্টার হয় নাকি!" নগেন এবার মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া হাততালি দিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এইবার ত বাবা ধরা প'ড়েছ—মেয়ে মানুষ ব্যারিষ্টার হয় না? সেকস্‌পীয়ারের 'মার্চ্চেণ্ট 'অব্ ভিনিস্' নাটক খানার ভেতর

পোর্সিয়া ব্যারিষ্টার সেজে কি কাণ্ডটাই না ক'রেছে।" এতবড় উদাহরণটা দিয়া সে যে নিজেকে মহা পণ্ডিত সাব্যস্ত করবার একটা প্রকাণ্ড সুযোগ পেয়েছে. এ আনন্দ তার অন্তরের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তির আস্বাদ দিতেছিল তাহা সে বেশ অনুভব করিল। ছেলেবেলায় 'ল্যাম্বস্ টেলস্ ফ্রম্ সেক্স্পীয়ারের' বঙ্গানুবাদে সে এ গল্পটা পড়িয়াছিল। আজ তাহা কাজে লাগিয়া গেল।

গিরিবালা বলিল, "ওসব বাজে কথা ছাড়, এখন কাজের কথা কি তাই বল।"

নগেন একগাল হাসিয়া বেশ একটু গম্ভীর ভাবে তুড়ি দিয়া বলিল, "এইত চাঁদ! কেবল বল আমার বুদ্ধি নেই—কই? কি কথা বল্‌ব বল দেখি, কতখানি বুদ্ধি রাখ?"

গিরিবালা বলিল, "নাও, তোমার যে তিন হাত লম্বা বুদ্ধি তা' বেশ বোঝা গেল, এখন কথাটা কি খুলে বল।"

নগেন গিরিবালাকে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে দেখিয়া মনে মনে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিল। গড়গড়ার নলটী মুখে দিয়া বলিল, "তবে এখন কথাটা বলি শোন। হরসুন্দর বড় চালাক, মনে করে, তা'র মত বুদ্ধিমান লোক ভূ-ভারতে নেই, তা'কি আজকালকার দিনে খাটে বন্ধু! এক মন্তরেই ধড়াস্। তা'র বন্ধু যোগেশ এটর্ণিটার কি অহঙ্কার। বলে কিনা, নালিস্ কর্‌তে পার, কেন বাবা আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি," বলিতে

বলিতে নগেন তড়াক্ করিয়া লাফ্ মারিয়া উঠিয়া পড়িল এবং দেরাজের উপর হইতে একটী 'হুইস্কির' বোতল লইয়া 'কর্কস্ক্রু' দিয়া বোতলটী খুলিয়া ফেলিল। পরে গিরিবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাণি! একটা সোডা আর গেলাস্‌টা দাও ত, এক ঢোক না খেলে আর কথা বল্‌তে পার্‌ছি না।"

গিরিবালা ইতিপূর্ব্বেই জানিত, নগেন দুইটী হুইস্কির বোতল আনিয়া রাখিয়াছে। সে দেখিয়াও যেন দেখে নাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে বলিল, "এ আবার কখন এলো? কই আমায়,ত কোন কিচ্ছু বল নি?"

নগেন সোডা দিয়া প্রায় অর্দ্ধ গেলাস সুরা এক নিঃশ্বাসে সেবন করিল, তারপর মুখখানি অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলিল, "চাট্ ফাট্ বুঝি কিছু আনাতে নেই, যা হো'ক একটা মুখে দেবার কিছু দাও?"

গিরিবালা বলিল, "কই টাকা দাওনা, এখনি চাট্ আন্‌তে দি। সকালের একটা ডিম্ সেদ্ধো পড়ে আছে ততক্ষণ সেইটা দিয়ে চালাও। তারপর ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া চাকরকে ডাকিল, "ও লালবিহারী! একবার উপরে আয়্ রে, বাবুর জন্যে কিছু খাবার আন্‌তে হবে।" লালবিহারী নীচে হইতে উত্তর দিল "এখনি আস্‌ছি।"

লালবিহারী আসিলে গিরিবালা নগেনের নিকট হইতে একটী টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তিনটে সোডা,

আট দোনা পান, এক প্যাকেট সিগারেট, আর এক পোয়া ভাল মাংস ; এর পর তখন খাবার আন্‌তে দিলেই হবে, এখন তুই এই গুলো নি'য়ে আয়, বুঝ্‌লি ?"

লালবিহারী অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্তে টাকাটী কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "ফৰ্দ্দত অনেক হ'লো, একটাকায় কি ক'রে হ'বে, সেদিকে দিদিমণির কি হুঁস্ আছে ?"

গিরিবালা একটুখানি চড়া অথচ কোমল স্বরে বলিল "এক টাকায় ও কটা জিনিস আর হ'বে না, তুই কি বলিস্ রে ?"

নগেনের মাথার মধ্যে রক্ত তখন বেশ একটু চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে,সুরার স্বাভাবিক ক্রিয়া ধরিয়াছে। মেজাজ্‌টী তখন অবস্থার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন মনে হইতেছিল যেন সমস্ত দুনিয়াটী তা'র পদানত, তা'র হুকুমের অপেক্ষায় মুখ চাহিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তুচ্ছ একটা বারটাকা মাহিনার হিন্দুস্থানী চাকরের সঙ্গে সামান্য পয়সা নিয়ে এতখানি মহামূল্য সময় অনর্থক নষ্ট কর্‌ছে এটা তার কিছুতেই বরদাস্ত হইল না। সে পকেট হইতে আর একটী টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "যা এখনি সব নিয়ে আস্‌গে —এবার কুলাবেত ?"

গিরিবালা লালাবিহারীর দিকে এমন ভাবে কটাক্ষ করিল, যেন সে চাহনি বুঝাইতেছিল, "এই ত চাই লালবিহারি !—এমন না হ'লে চাকর !"

অল্পক্ষণ পরে লালবিহারী সমস্ত জিনিস্ আনিয়া দিল, এবং দুইটা পয়সা ফেরৎ দিয়া বলিল "দিদিমণি! ঐ দুটা পয়সা ফেরৎ আছে যেন তুলতে ভুল্‌বেন না। আর হিসাবটা কি শুন্‌বেন?"

নগেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কে তোর হিসাব চাচ্ছে, যা তোর নিজের কাজে।"

লালবিহারী নগেনের অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, এই লক্ষ্মীছাড়া বাঙ্গালীবাবুগুলো ভেড়ার চেয়ে অধম, এরা না থাকলে আমাদের উপায় কি হ'ত?"

নগেন বলিল, "রাণি! ধর এই গেলাস্‌টা, কেবল আমাকে দিচ্ছ, তুমি ত খাচ্ছ না; তা হ'চ্ছে না ধন, নগেন বাবা তেমন ছেলে নয়, বলিয়া গেলাস্‌টা গিরিবালার মুখের নিকট ধরিল, সে একনিঃশ্বাসে সমস্ত শেষ করিয়া লইল, ইহাতে নগেন মহা উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "সাবাস্! এই ত চাই।"

গিরিবালা বলিল, "কথায় কথায় আসল ব্যাপারটা যে চাপা পড়ে গেল— তোমার কীর্ত্তিটা খুলে বল, বলিয়া নগেনের কোলে মাথা দিয়া গিরিবালা শয়ন করিল।

নগেন আগ্রহভরে তা'র মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "হরসুন্দর এখন বৃন্দাবন গেছে, সেখানে আমার ভাইঝি ললিতা আছে, তা'ত তুমি জান। খুব মজা হয়েছে, হরসুন্দর

তা'র বিষয়ের খানিকটা ললিতাকে উইল করে দিয়েছে, তাও তুমি শুনেছ ?"

গিরিবালা বলিল "এসব শুনেছি, তাতে কি হ'য়েছে ?"

নগেন অত্যন্ত উল্লাসসহকারে বলিল, "তাতে কি—না— হ'য়েছে ? ললিতা গৃহত্যাগিনী কুলটা প্রমাণ হবার সম্পূর্ণ সুবিধা হ'য়েছে। হরসুন্দর যে তা'কে বের করে নিয়ে গেছে একথা প্রমাণ হ'তে একতিল বিলম্ব হ'বে না।"

গিরিবালা বলিল, "এতে তোমার কি লাভ হবে ? আর হরসুন্দরেরই বা কি ক্ষতি হবে ?"

নগেন বলিল, "একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। একি কম বুদ্ধি খাটিয়েছি, গোড়া থেকে হরসুন্দরের সঙ্গে ললিতার বিয়ে দিতে কেন বাধা দিয়াছিলাম, এইবার তা' বুঝ্‌তে পার্‌বে। বৌ-ঠাকরুণের ছেলেমেয়ে কিছুই নেই, ললিতারও ভাই-বোন নেই, হরসুন্দরের সঙ্গে বিয়ে হ'লে, বিষয়টা সব হরসুন্দরের হ'য়ে যেতো। পৈত্রিক-বিষয়টা বাবা মুফতে উড়ে যাবে, আর আমি বেটা টাকার জন্য এর দোর্ তা'র দোর্ ঘুরে বেড়াব ? কি মজা রে ! এই জন্যেইত উকিলরা আমার প্রশংসা কর্‌লে।"

গিরিবালা বলিল, "তা এখন করেছ কি ?"

নগেন বলিল, "দাঁড়াও বাবা, গলা শুকিয়ে উঠেছে, একটু খানি ভিজিয়ে নি" বলিয়া এক গেলাস্ নিজে খাইল, আর এক গেলাস্ গিরিবালাকে দিল। গিরিবালা এবার খাইতে বিশেষ

আপত্তি করিল, কারণ তখন তার মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, কিন্তু, বন্যার স্রোতের মুখে কুটার মত তা'র সমস্ত আপত্তি মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল।

নগেন একটুকরা মাংস মুখে দিয়া বলিল "উঃ! ব্যাটা কি ঝালই দিয়েছে! আমি আজ হরসুন্দরের নামে উকিলের চিঠি দিয়েছি যে তুমি আমার বিধবা ভাইঝিকে ভুলাইয়া কৌশল করিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেছ, সুতরাং তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? যদি সাতদিনের ভিতর আদালতে হাজির না কর, তবে তোমাকে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে, না পার তবে তোমার নামে আইন অনুসারে নালিস কর্‌ব। কেমন রাণি! এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি কি না?" বলিয়া টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে হা, হা, শব্দে উচ্চহাস্য করিল।

গিরিবালার নেশা তখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, সে নগেনের হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "সব ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু কি ক'রে প্রমাণ কর্‌বে যে ললিতা হরসুন্দরের সঙ্গে এক বাসায় থাকে।"

নগেন জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল, "এই সোজা কথাটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না? দুটা লোক সাক্ষী খাড়া করে দেব।"

গিরিবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, "তুমি 'কোর্টে' দাঁড়িয়ে বল্‌তে পার্‌বে যে ললিতা কুলটা?"

নগেন পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "আরে

ছ্যা! নিজের স্বার্থের জন্য কত লোক কত কি করছে, আর আমি বৌ-ঠাকরুণকে এক সঙ্গে জড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয়ের জন্য এই সামান্য কাজটা করতে যদি না পারি, আমার গলায় দড়ি!"

নেশায় গিরিবালার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, সে জোর করিয়া নগেনের মুখের দিকে অত্যন্ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া কি দেখিয়া লইল। একটী কথাও সে বলিল না। পাথরের মানুষের মত কেবল চাহিয়া রহিল।

নগেন বলিল, "রাণি, যদি এই কাজটা করতে পারি তবে মা কালীর দিবিব করে বলছি তোমাকে বাড়ীওয়ালী নিশ্চয় করে দেবো যে জীবনে তোমার কোন কষ্ট থাকবে না।"

আজ নগেনের কথায় গিরিবালার নেশা যেন কাটিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ তা'র নয়নসমক্ষে তা'র অতীত জীবনের এমন একটী নিদারুণ চিত্র ক্ষণকালের জন্য তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কেমন করিয়া তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, কেমন করিয়া একদিন তাহার আত্মীয় মিথ্যা অভিযোগ দিয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী হইতে বাধ্য করিয়াছিল, সে কথা আজ তার বার বার মনে পড়িতেছিল। তাহার নয়ন কাটিয়া অশ্রুস্রোত বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু হায়, সমাজ তাহার কি কোন অনুসন্ধান করিয়াছিল? তা' যদি করিত তবে কি সে আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য আপনার সতীত্ব বিসর্জ্জন দিত, না এই সব

নরাধম, তার পবিত্র অঙ্গ কোনদিন স্পর্শ করিতে সাহস পাইত ? আজ যেন তার নারীত্ব আত্মমর্য্যাদায় সর্ব্বদিক হইতে গিরিবালাকে নিদারুণ আত্মগ্লানিতে নিপীড়িত করিল। সে যেন কিছুতেই আপনাকে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মিলাইতে পারিতেছিল না। তাহার বুক ফাটিয়া যেন একটা অসহায় রোদনস্রোত বাহির হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে তা'র বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। গিরিবালার কেবলই মনে হইতেছিল, এই নররক্তলোলুপ পিশাচগুলা কি পুণ্যে মানুষ হবার অধিকার পেয়েছে! ললিতার জন্য গিরিবালার অন্তর আজ নিজের দুঃখ ও অবস্থা দিয়া ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল।

গিরিবালা আজ যেন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তার এই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইল। তার মাথার মধ্যে যেন আগুণ জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর একমুহূর্ত্ত নগেনের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিল না। সে এই আট বৎসরের ভিতর কত লোকের সহিত বসিয়া মদ খাইয়াছে, মাতাল অবস্থায় কত রকম অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে। যে সব কাজ করিতে প্রথম প্রথম তা'র লজ্জা হইত, সেই সব কাজ করিতে এখন আর কিছুই ঠেকে না সত্য, তথাপি আজ যেন তার অন্তরের ক্ষতস্থানে সহসা কে প্রবল বেগে খোঁচা মারিয়া রক্তধারা ছুটাইয়া দিয়াছে। আজ যেন প্রতিশোধ লইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গিরিবালার আজ বড়ই কান্না পাইতেছিল, স্বার্থের জন্য আপনার

ভাইঝিকে একজন বেশ্যার নিকট কুলটা প্রচার করিতে হত-ভাগ্যের মনে এতটুকু লজ্জা বা ঘৃণা হইল না, আবার তাই নিয়ে আস্ফালন, ওঃ কি ভয়ঙ্কর ! সে ছুটিয়া ঘর হইতে বারান্দায় ঠাণ্ডা বাতাসে গিয়া দাঁড়াইল।

নগেনের তখন অত্যন্ত নেশা হইয়াছিল, সে পড়িয়া পড়িয়া জড়িতকণ্ঠে ডাকিতেছিল, "রাণি ! কোথায় গেলে, আমার কাছে এসো, তোমাকে বাড়ীওয়ালী করে তবে ছাড়্‌ব।"

গিরিবালার আর সহ্য হইল না, সে বারান্দার রেলিংএর উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল, "লালবিহারি ! একবার ওপরে আয়।" লালবিহারী আসিলে বলিল, "ওই বদ্‌মাইস লোকটাকে বাড়ী থেকে বের করে দে।"

নগেনের কাণে এ কথা পৌঁছিবামাত্র সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কার বাবার সাদ্দি আমাকে বের করে দেয়।"

গিরিবালা বুঝি সেদিন সকল সহ্যের অতীত অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং সে কোন কথার উত্তর না দিয়া, নির্ম্মম-ভাবে তার গলা ধরিয়া এক ধাক্কা মারিল; বারান্দার থামে মাথা লাগিয়া নগেনের মাথা ফাটিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইল। গিরিবালা সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না, সে ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নগেন দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথমটা অনেক গালাগালি

করিল, শেষে অনুনয়বিনয় করিতেও ছাড়িল না। অবশেষে কাঁদিয়া বলিল, "রাণি, আজকের মত দরজা খোল্, কেন তোর রাগ হল আমাকে খুলে বল্, আমি শপথ করে বল্ছি, দুমাসের ভিতর তোকে বাড়ীওয়ালী করে ছাড়্ব, মনে কর্ছিস্ আমার মিথ্যে কথা—না ?"

সেদিন, গিরিবালা হাঁ, না কোন উত্তরই দিল না, বা এত হাঁকাহাঁকিতে একবার কর্ণপাতও করিল না। অপর একটা ঘর হইতে কে একজন তীব্রস্বরে বিকৃত চীৎকার করিয়া বলিল, "কে ও লোকটা মাতলামি কর্ছে, ওকে কেউ বের করে দিগ্ না।

লালবিহারী অবশেষে তাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিল।

১৬

এত আয়োজন করিয়াও অবশেষে যোগেশের বাটী হইতে বাহির হওয়া ঘটিয়া উঠিল না। ইতিপূর্ব্বে 'যাইতেছি' বলিয়া হরসুন্দরকে সে একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ সরলা পীড়িত হইয়া পড়ায় পুনরায় টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না—এখন আর কোন আশঙ্কা নাই।"

সরলা একটু সারিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ তার এই অসুখটা করার জন্য সে যেন যোগেশের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সে যেন কি করিয়া তার সন্তোষ বিধান করিবে এমনই একটা ভাব সততই তা'র মনে জাগিতেছিল। যোগেশ যে তাহা বুঝিতে না পারিয়াছিলেন তাহা নয়।

আজ সাত আট দিন হইল সরলা পথ্য করিয়াছে, বেশ একটু বলও পাইয়াছে। সে একখানি আরাম-চৌকিতে বসিয়া কি একখানি বই পড়িতেছিল, এমনসময়ে সুরমা আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া নিকটে বসিয়া বলিল, "আজ কেমন আছ দিদি?" সুরমা এ কয়দিন প্রতিদিনই সরলাকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং তার অসুখের সময় যথেষ্ট সেবা-যত্নও করিয়াছিল। সরলা আগ্রহভরে সুরমার হাতখানি নিজের হাতের উপর

তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমি কোথা মনে করছিলাম তোমার ওখানে বেড়িয়ে আসব। আজ বেশ ভাল আছি। কনককে নিয়ে এলে না কেন ভাই? মেয়েটা বড় লক্ষী, আমার অসুখের সময় সেও তোমার সঙ্গে যথেষ্ট খেটেছে।"

আজ বট্‌ঠাকুর কোথায়, "এখনও কি কাছারি থেকে আসেন নি?"

"আসবার সময় হয়েছে, এখনি এলেন বলে, তাঁর কাছে আমি ভারি লজ্জিত হ'য়ে আছি। এতবড় আনন্দটা সব আমিই মাটি করে ফেলেছি।"

সুরমা বলিল, "এতো ভারি জুলুমের কথা, এতে তোমার অপরাধ কি? শরীরের উপর কারো ত এক্তার নেই, রোগে হ'য়ে পড়্‌ল, তুমি তার কি করবে? এখন যে ভগবানের কৃপায় ভাল হ'য়েছ, এটাতেই আমাদের মস্ত আনন্দ। আজ একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে ঞ্"

সরলা তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিয়া উদ্বেগাকুলকণ্ঠে বলিল, "কি হ'য়েছে?" সুরমা বলিল, "দুপুর বেলা রোজ যেমন কনককে মহাভারত পড়ে শোনাই আজ তেমন পড়্‌ছি, এমন সময়ে একটা অপরিচিত ঝিরমত স্ত্রীলোক আসিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, "আপনি বুঝি হরসুন্দরবাবুর স্ত্রী সুরমা, তা বেশ, ভালই হয়েছে, একেবারেই আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো, তা বসি—বড়

শীত, হাত পা যেন কন্ কন্ করছে, তা তুমি ত বেশ—"আমি তার কথায় বাধা দিয়া বল্লাম "কাকে খুঁঝ্‌ছ!"

সরলা বলিল, "কোত্থেকে এই লক্ষীছাড়া মাগী এসে জুটল?"

সুরমা বলিল, "প্রথমটা তা'র কথাবার্ত্তা শু'নে আমার কেমন ভয় হ'লো, তারপর যখন বল্লে "ললিতার কাকা বাড়ীর ঝি" তখন হাফ্ ছেড়ে বাঁচি। বল্‌লাম "কি মনে করে এখানে এসেছ?"

তা'র সেই ভাঁটার মত গোল গোল চোখ দুটার দৃষ্টি যেন কুমারের চাকের মত ঘরের চারিদিকে ঘুরিতেছিল, ইতিমধ্যে আমার মুখের দিকে বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "তা দিদি আস্‌তে কি নেই গা, হরসুন্দরবাবু বুঝি এখানে নেই? তিনি বুঝি পশ্চিম বেড়াতে গেছেন, এঁ্যা! কিছু বল্‌ছ?" বলিয়া মাগী কনকের দিকে ইসারা করিয়া দেখাইয়া বলিল "ওকে এখান থেকে যে'তে বল, তোমার সঙ্গে গোপনে কথা আছে।" কনকের সম্মুখে কোন কথা প্রকাশ কর্‌তে সে ইতস্ততঃ কর্‌ছে দেখে কনককে ডে'কে বললাম "তুই মা এখন একবার বাড়ী যাতো।" কনক চলিয়া গেলে, মাগী বেশ জম্‌কে বস্‌লো এবং কণ্ঠস্বর বেশ একটু সহানুভূতিকাতর ক'রে বল্লে, "দেখনা ঘরে এমন বৌ, আর একি ব্যাভার বাপু, কাণে আঙ্গুল দিতে হয়"—আমি উচ্চকণ্ঠে বল্‌লাম, "কি বল্‌ছ! কার কথা বল্‌ছ?"

"মাগী তখন আর একটু আমার কাছে সরে এসে বল্লে, "এই তোমার স্বামীর কথা গো—ছিঃ! কাজ্‌টাকি ভাল হয়েছে?

হাজার হো'ক ভদ্রলোকের ঘরের বিধবা, তায় মেয়েমানুষ সে অত শত কি বোঝে বল? তা'কে নিয়ে যাওয়া। সে জন্য নগেনবাবু আমাকে তোমার কাছে পাঠালেন, বল্লেন হিমির-মা একবার তুই যা'তো ভদ্রলোকের মেয়েকে সব কথা বলে আয় ত, তিনি হয়ত এসব কথা কিছুই জানেন না।"

সয়তানীর কথা আর আমার সহ্য হ'লো না, মনে হ'লো মানুষ পারে না এমন কাজ বুঝি বিধাতাও সৃষ্টি করতে পারেন না? তারপর তা'কে বল্লাম, "তুমি ভাল চাও ত এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে চলে যাও বলছি, নতুবা অপমান করে তাড়িয়ে দিতে কিছুমাত্র দুঃখিত হ'ব না।"

আমার কথায় সে যেন তেলেবেগুনে জলে উঠ্‌ল এবং বল্লে, "ওমা ছুঁড়ীর তেজ দেখ না!" তারপর হাত-পা নাড়তে নাড়তে সে নে'মে যেতে যেতে বল্লে, "টের পাবে বাবা, বাবু কাল্‌কেই নালিশ করে দিয়েছেন, যখন পেয়াদা এসে দাঁড়াবে তখন মাগীর কথা গুড়ের মত মিষ্টি মনে হ'বে। কলিতে কারো ভাল করতে নেই" বলে, মাগি ফর্ ফর্ করে চলে গেল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত অনেকক্ষণ ঘরের মেঝের উপর বসে রইলাম।

সরলা নির্ব্বাক হইয়া সকল কথা শুনিতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল, নগেনবাবু যে এমন কিছু একটা মতলব খাটাবে, সে দিন তা'র কথাবার্ত্তা শু'নেই বোঝা গিয়েছিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নগেনবাবু একটা লম্পট,

মাতাল, এদের অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। উনি আসুন রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে।" এই সময় যোগেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে সুরমাও এসেছে।" তারপর সরলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?"

সরলা বলিল, "ভাল আছি, ভারি ত অসুখ, আজ কদিন হ'লো ভাত খাচ্ছি, বেশ আছি।"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা এখন বলবে বটে, যখন হ'য়েছিল তখন যে সব অন্ধকার দেখিয়ে দিয়েছিলে।"

সরলার লজ্জায় মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটা অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতার ভারে তার চক্ষু উজ্জ্বল ও নত হইয়া পড়িল। সে আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যোগেশ বলিলেন, "আমি কাপড় ছেড়ে আসছি, সুরমা যেন এখনি যায় না।"

যোগেশ জলটল খাইয়া আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, "সরলা তোমার বোধ হয় নগেনবাবুর সেদিনকার কথা মনে আছে, ব্যাটা কি পাজি; কি করেছে জান, হরসুন্দরের নামে একটা কুৎসিত বদনাম দিয়ে নালিস ক'রেছে; উদ্দেশ্য ললিতাকে ও তা'র বড় ভাজকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ ক'রে বিষয়-সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করা। তা'র আস্পর্দ্ধার কথা শোনো, তুমি ত রমেশবাবুকে জান, আমাদের একজন বাল্যবন্ধু। তা'কে ঘুষ দিয়ে সাক্ষী

করতে গিয়েছিল, সে একথা শু'নে, মারতে উদ্যত, ব্যাটা সেখান থেকে পালিয়েছে। রমেশ আজ আমার আপিসে উপস্থিত, সে কি প্রথমে সব কথা বলতে পারে, রাগে তার সর্ব্ব শরীর কাঁপছিল। বল্লে,—"হরসুন্দরের বিরুদ্ধে এত বড় কথা কেউ মনে করতে পারে—এমন লোক যে পৃথিবীতে আছে তা জানতুম না, আজই ব্যাটার নামে মানহানির নালিস করে দাও। "ললিতা একথা শুনলে কি মনে করবে? নিজের ভাই-ঝি আর আপনার মেয়েতে কি প্রভেদ? এত বড় নির্লজ্জ ও স্বার্থপর লোক পৃথিবীতে থাকতে পারে? ব্যাটার প্রথম থেকেই এই সব মতলব! নইলে ললিতার বে'টা কি আর ভাঙ্গে?"

সরলা উদ্বিগ্নচিত্তে বলিল, "তা তুমি কি করবে' মনে করছ?"

যোগেশ বলিলেন, "মনে আর কি করব, ব্যাটার নামে আজ নালিস রুজু করে দিয়ে এসেছি। দেখা যাক্, ব্যাটা কেমন ক'রে মোকদ্দমা চালায়।"

সরলা, স্বামীর নিকট সুরমার অদ্যকার সমস্ত ঘটনাটী বলিল। যোগেশ শুনিয়া বলিলেন, "এটাও এ মোকদ্দমার একটা জোর প্রমাণ হবে। সুরমা এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, আজ সে যোগেশের সহিত মুখোমুখী কথা কহিয়া বলিল, "দেখুন, আমার স্বামীর এত বড় নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, তাঁ'র মত

চরিত্রবান্ পুরুষ, তাঁ'র ন্যায় সত্যবাদী লোক আজকালকার দিনে আছে কিনা জানি না, তিনি স্বর্গের দেবতা! আমি তাঁ'কে যতখানি চিনি, বোধ হয় আর কেউ ততটা চেনে না। আমার চেয়ে কেউ তাঁর অন্তরটা বেশী ক'রে দেখেনি—আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি এই লোকটা জব্দ হয়, তাও করতে হবে, আপনার কাছে আমার এই একমাত্র অনুরোধ", বলিতে বলিতে সুরমার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল।

যোগেশ বলিলেন, "এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে হ'বে না, আমি ব্যাটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবো।"

সুরমা এই আশ্বাস বাক্যে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

যোগেশ বলিলেন, "সরলা! সুরমা সত্য সত্যই দেবী। কি অগাধ প্রেম! স্ত্রীলোক মাত্রেই এরূপ কথা শু'নে বিচলিত না হয়ে যায় না।"

সরলা বলিল, "এ কথা তোমাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই বলেছি সুরমার প্রেমের তুলনা নাই।"

তারপর সেই রাত্রিতে যোগেশ হরসুন্দরকে পত্র লিখিতে বসিলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া লিখিয়া তাঁহাকে কলিকাতা চলিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

১৭

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "ললিতা! এ রাধা-কুণ্ড শ্যাম-কুণ্ড ছে'ড়ে আর কোথাওত যে'তে ইচ্ছা করে না রে?"

ললিতা বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু জ্যেঠাইমা এখানে তোমার শরীর মোটেই ভাল থাক্‌ছে না, সেটা কি বুঝ্‌ছ?" মহামায়া কোন কিছু উত্তর না দিয়া মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। কি যেন একটা গভীর চিন্তা জ্যেঠাইমার মনের মধ্যে তখন আন্দোলিত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে ললিতাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "ওটা কি আর ভাব্‌বার কথা রে! আচ্ছা ললিতা! আমি যদি আর দেশে ফিরে না যাই, তা'হলে কি তুই আমার কাছে চিরদিন এমনি করে থাক্‌তে পার্‌বি? তোকে নিয়ে যেন একটা মস্ত গোলে পড়েছি রে!"

ললিতার দুই চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অতিকষ্টে বলিল, "জ্যেঠাইমা, তোমার কাছে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না ত কোথায় থাকতে পার্‌ব জ্যেঠাইমা? তুমি কি এখনও আমার হৃদয় বুঝ্‌তে পারনি?" আজ প্রথম ললিতা তার জ্যেঠাইমার নিকট কাঁদিল। কতখানি মর্ম্মবেদনার যে ললিতার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িয়াছে, তাহা মহামায়ার বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। মহামায়া ললিতার

মস্তক সস্নেহে ও আগ্রহে বক্ষের মধ্যে টানিয়া অল্প অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ললিতা! আমি তোকে চিনি না, এ বিশ্বাস তোর মনে মনে হয়? জ্যেঠাইমার তুই যে সব, তুই যে তার তপ, জপ, জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, কর্ম্ম রে। তোকে ছে'ড়ে যে জ্যেঠাইমা এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না, তা' কি তুই জানিস্ না! তবে মা, তোর যে কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না, এ দুঃখই সব চেয়ে বড় দুঃখ, সেটা দিনরাত কাঁটার মত আমাকে শয়নে স্বপনে বিঁধ্‌ছে। কত রকমই ভাব্‌ছি, একটাও স্থির করতে পার্‌ছি না। তাই তো'কে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম তুই কি আমার কাছে চিরদিনই এমনি ক'রে থাক্‌তে পার্‌বি? আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে—থাক্, গুরুদেবের সঙ্গে একটা যুক্তি করে তারপর তোর মত নেব। আমি আজ একমাস হ'লো হরসুন্দরকে তার বাড়ীতে চিঠি দিয়েছি, কই কোন জবাব ত পেলুম না? ভালখবরটা পেলেও বাঁচি, অনেক দিন তা'কে দেখিনি, তা'র জন্যে বড় মন কেমন কর্‌ছে রে ললিতা।"

ললিতা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "সে যাই হোক্, তোমাকে কিন্তু আর এখানে থাক্‌তে দিচ্ছি না, এখানটা তোমার মোটেই সহ্য হচ্ছে না, আজই জ্যেঠাইমা এখান থেকে চল।" ললিতার মনে হইতেছিল, যাঁ'র সংবাদের জন্য তুমি এত চিন্তিত হ'য়েছ, তিনি ত তোমার নিকটে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আজ একবার মনে করিল, হরসুন্দর বৃন্দাবনে আছেন এ সংবাদটা দিই, তা'হলে জ্যেঠাইমা এই দণ্ডেই চলে যাবেন। কিন্তু কেমন একটা

সঙ্কোচ পদে পদে তাহাকে বাধা দিতে লাগিল, সুতরাং ললিতা সে কথা আর বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ললিতা বলিল, "হয়ত তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন—তোমার চিঠি পান নি এ কথায় মহামায়ার যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "তাই হ'বে। হরসুন্দর আমার তেমন ছেলে নয় যে তার জ্যেঠাইমার চিঠি পেয়ে সে চুপ ক'রে বসে থাকবে। ঠিক বলেছিস ললিতা, নিশ্চয়ই সে বাড়ী নেই।"

সে দিন বৈকালেই মহামায়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। ললিতা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। রায়মহাশয় বাড়ীতে অসুখ বলিয়া আজ কুড়িদিন হইল দেশে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি বাড়ী পৌছিয়া নগেনবাবুর সমস্ত কীর্ত্তির কথা লিখিয়া মহামায়াকে পত্র দিয়াছেন। সে পত্র এখনও মহামায়ার হস্তগত হয় নাই। কুঞ্জবামিনী মহামায়াকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সেখানে আসিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর একথা সেকথার পর বলিলেন, "আপনার গুরুদেব কাল এসে ফিরে গেছেন, তুই একদিনের ভেতর আবার আসবেন ব'লে গেছেন। ভালকথা, আপনাদের একখানি চিঠি আছে, এনে দি" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চিঠির কথায় মহামায়ার অন্তর বিপুল আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তিনি যেন এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না, ললিতাকে বলিলেন, "যা তো মা, চিঠি খানা নিয়ে আয় ত; নিশ্চয় হরসুন্দরের চিঠি না হ'য়ে যায় না।"

তপস্যার ফল

মহামায়া যে হরসুন্দরকে কি পত্র দিয়াছিলেন এবং কবে দিয়াছিলেন, ললিতা এসব সংবাদ কিছুই অবগত ছিল না। তবে মধ্যে কয়েকদিন হরসুন্দর ও তাহার কথা লইয়া গুরুদেবের সহিত রীতিমত তর্ক হইয়াছে, একথাটা ললিতা, কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল। মহামায়া স্পষ্ট করিয়া কোন কথা না বলিলেও তাহার কথার ভাবে ললিতা বুঝিতে পারিতেছিল, যে জ্যেঠাইমা গুরুদেবকে সম্মত করে আমার একটা বিধবাবিবাহ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চান। ললিতার চিঠি আনিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, মহামায়া ডাকিলেন, "ও ললিতা! কি হলো রে, দেরি করছিস কেন, নিয়ে আয় না মা?"

জ্যেঠাইমা, হরসুন্দরকে পত্রের মধ্যে ঠিক ললিতা যা মনে করেছে, সেই বিষয়ই প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন এবং সমস্ত দায়িত্ব যে তিনি নিজ স্কন্ধে বহন করিবেন, তেমন কথাও খুব জোরের সহিত লিখিয়াছিলেন সুতরাং হরসুন্দর পত্রের উত্তরে, কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ললিতা বলিল "বাই, চিঠিখানি কোথায় রেখেছেন, খুঁজে পাচ্ছেন না।" ললিতার উত্তরে মহামায়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজেই উঠিয়া আসিলেন, তখন বিছানার নীচে হইতে চিঠি খানা পাওয়া গিয়াছে; ললিতা চিঠি খানি মহামায়ার হাতে দিল। চিঠি পড়িয়া মহামায়া ক্রোধে অগ্নিময়ী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী

সুতরাং তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "ললিতা এদিকে আয় ত মা?"

ললিতা অকস্মাৎ জ্যেঠাইমার ভাবান্তর দেখিয়া যেন কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল। কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। ললিতার মনে হইল, তিনি কি জ্যেঠাই-মার কথার কোনরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন? পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর পলায়নচেষ্টার ন্যায় ললিতার মনের মধ্যে নানাপ্রকারের প্রশ্নোত্তর সঙ্কোচরুদ্ধ মনের কবাট খুলিয়া বাহির হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন "ললিতা! তুই তোর জ্যেঠাইমার জন্য, একটা গুরুতর কঠিনকাজ হ'লেও যে কর্‌তে পার্‌বি এমন বিশ্বাস আমার আছে, তবুও তোর মুখ থেকে কথাটা শু'নলে যেন আমি আরও তৃপ্তি পাই।"

ললিতা বলিল, "কি কথা জ্যেঠাইমা? আমি কোন দিনই ত তোমার কোন কথায় আপত্তি করিনি—তবে কেন আজ এমন ক'রে একথা জিজ্ঞাসা করছ?"

মহামায়া বলিলেন, আমি ঠাকুরপোর অনেক অপরাধ ক্ষমা ক'রেছি, কিন্তু আর না, আমি তা'কে শিক্ষা দিতে চাই, আমি তা'কে বোঝাতে চাই, যে আমি বিধবা মেয়েমানুষ হ'লেও তা'র সকল দুরভিসন্ধি বুঝি এবং বুঝি বলেই তার সংশ্রব ত্যাগ কর্‌বার জন্য এখানে এসে আছি। তাতেও তার তৃপ্তি নেই? সে কিনা হরসুন্দরের চরিত্রের উপর দোষ দিয়ে তা'র নামে মিথ্যা

মোকদ্দমা রুজু করেছে, মনে করেছে, সমস্ত বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে হস্তগত করবে। সে আশা তা'কে জলাঞ্জলি দিতে হ'বে। এখন তোকে কিন্তু মা খুব শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। যে জন্য আজ ক'দিন ধরে অনবরত ভাবছি, আজ গোবিন্দজী সে ভাবনার মীমাংসা করে দিয়েছেন।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কে চিঠি দিয়াছে ?"

মহামায়া চিঠিখানি ললিতার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ্ রায়মশাই লিখেছেন, কতবড় আস্পর্দ্ধার কথা—" জ্যেঠাই-মাকে ললিতা এতখানি রাগিতে বা বিচলিত হো'তে কোন দিন দেখে নাই। ললিতা চিঠিখানি পড়িয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল।—মহা সমস্যার কথা। জ্যেঠাইমা যে কি বলিতে চাহিতেছেন এবং কেমন করিয়া নগেনবাবুকে জব্দ করিতে চান, এক মুহূর্ত্তের ভিতর সে কথাও ললিতা ভাবিয়া লইল। কিন্তু মনে মনে ভাবিল, এমন একটা ব্যাপার ঘটিলে নিশ্চয়ই লোকে মনে করিবে, এই সকল দুর্নামের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য —আশঙ্কায় এ কাজ করেছে। এত বড় একটা কলঙ্ক কিরূপে তাঁহার মাথার উপর তুলিয়া দিতে পারি ? মহামায়া বলিলেন, "ললিতা ! একবার গুরুদেবকে সংবাদ পাঠাত মা ? তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন।"

১৮

হরসুন্দর যখন সাধন-কুঞ্জের দ্বারে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন জ্যেঠাইমাকে পথের উপর যাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার নিকটে আগ্রহভরে বলিলেন "জ্যেঠাইমা তুমি কবে এলে? ভাল আছ ত?" হরসুন্দরের মুখের উপর বহুদিন পরে একটা উল্লাসদীপ্তি উদ্ভাসিত হইল। ব্যস্তভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্যেঠাইমাকে প্রণাম করিতেই মহামায়া জননীর স্নেহাভিভুতঅন্তরে অশ্রুপ্লাবিতনয়নে হরসুন্দরের চিবুক-স্পর্শ করিয়া বার বার চুম্বন করিলেন। মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা তুই সুখী হ। তো'কেই আজ কদিন খোঁজ করছি রে, তুই আমার চিঠি পাসনি?"

হরসুন্দর একদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি স্নেহানুযোগপীড়িত করুণকণ্ঠে বলিলেন "আয় সুন্দর আমার সঙ্গে আয়, তোর যে শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে রে? আমি দেখ্‌ছি দেহের প্রতি তোর মোটেই যত্ন নেই, অমন করে আপনাকে অবহেলা করার মধ্যে ভগবানের কাছে অপরাধ করার দোষ আছে রে—সেটা মনে রাখিস্" বলিয়া তিনি হরসুন্দরকে সাদরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। হরসুন্দরের হৃদয় সহসা স্নেহবন্যার বিপুল আঘাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, এবং জ্যেঠাইমার সঙ্গে চলিলেন ; যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন কুঞ্জস্বামিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরসুন্দরকে মহামায়ার সহিত অত্যন্ত আত্মীয়ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "বাবু বুঝি তোমাদের আপনার কেউ হবেন ?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন "হাঁ্যা মা, এটী আমার বড় ছেলে ; তুমি কেমন করে চিন্‌লে ?"

কুঞ্জস্বামিনী মুখের উপর একটা দুঃখের ভাব আনিয়া নাকিসুরে উত্তর করিল, "তা কি জানি মা, বাবু যে প্রথম একবার এবাড়ীতে এসেছিলেন। সে দিন ওঁর কিছু খাওয়া হয় নি। আমার বেতোধাত্, উঠ্‌তে পারিনি বলে, ললিতাকে বল্লাম —মা একটা আলো ও ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে আয়্ তো, তার পরদিন দেখি সব যেমন তেমনি পড়ে আছে। ললিতাও ত কিছু বল্লে না—কিছু মনে ক'রোনি বাছা।"

হরসুন্দর এতদিন পরে আজ খাবার রাখার ইতিহাস অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন "জ্যেঠাইমা সেদিন রেলে এসে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কিনা,—যেমন শুয়েছি আর কেমন করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছুই জান্‌তে পারিনি। তোমরা যে এখানে আছ তা কি জানি।" এই সময় মহামায়ার গুরুদেব

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামায়া গুরুদেবকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি আমার ইষ্টদেব, সুন্দর! ওঁকে প্রণাম কর্।"

হরসুন্দর গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মহামায়া বলিলেন, "বাবা সবই আপনার মহিমা; সেদিন আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বড়ই ভাবিত হয়েছিলাম।"

গুরুদেব খুব প্রশান্তভাবেই উত্তর করিলেন, "মা সবই তাঁর ঠিক করা আছে, যিনি সকল ভাবনার নিয়ন্তা, তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে চলা কি কখন সম্ভবপর?" তারপর গুরুদেব বলিলেন, "রাধাকুণ্ডে কেমন কাটালে মা?"

মহামায়া বলিলেন, "আমার খুব ভাল লেগেছে, মোটেই আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না, ললিতা জোর করে নিয়ে এলো। বাবা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলাম—বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজ হরসুন্দর এসেছে।"

গুরুদেব বলিলেন, "তা আজ থাক্, আর এক দিন হবে এখন।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে সেই কথাই ভাল।"

সকলেই গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। মহামায়া বলিলেন, "বাবা, কাল একবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ দরকার।" তিনি উত্তর করিলেন, "আচ্ছা আমি আস্‌ব এখন।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "ললিতা খাবার দাবার যোগাড় কর্—

হরসুন্দর অনেকদিন আমার কাছে বসে খায় নি, আজ আমি তাকে কাছে ক'রে খাওয়াব।"

হরসুন্দর বলিলেন, "তুমি না বল্লেও তোমার প্রসাদ না খেয়ে, আমি কি আজ উঠ্‌ব মনে করছ জ্যেঠাইমা ?"

এ স্নেহের আব্দার জ্যেঠাইমা আজ বার বৎসর শুনেন নাই। তাঁহার সমস্ত অন্তর আকুল করিয়া যে বেদনা তাঁহার হৃদয়কে পীড়িত করিতেছিল, তাহা তিনি মুখ ফুটিয়া প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মুখের উপর এমন একটি দুঃখের বিষাদছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল, যাহা তিনি কোন প্রকার সংযমের দ্বারা সংযত করিতে পারিতেছিলেন না। হরসুন্দর তাহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া বলিলেন, "জ্যেঠাইমা ! চান্ টান্ করে আসি।"

১৯

সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্যেঠাইমার সঙ্গে গুরুদেবের অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

গুরুদেব বলিলেন, "এ বিবাহে কোন দোষ নাই, এ শাস্ত্র-সঙ্গত। তা'র উপর পাত্রপাত্রী কেহই অল্পবয়স্ক নয়। উভয়েই লেখাপড়া জানে, সংযত এবং বুদ্ধিমান। যৌবনের মোহ উভয়েরই অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, অনেকদিন ত আপনাকে ললিতার সকল কথা খুলে বলেছি। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ হরসুন্দরই ললিতার স্বামী, কি বলেন?"

গুরুদেব বলিলেন "মন্ত্র পড়ে লোকতঃ অন্যের সহিত ললিতার পরিণয় যে কারণেই হোক, মনে মনে হরসুন্দরের সহিত ললিতার সত্যই বিবাহ হয়েছে, তার আর কোন সন্দেহ নাই।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "বাবা, আমার একান্ত ইচ্ছা এ বিবাহ হয়। আমার দেবরের ব্যবহার সব দেখ্ছেন ত? আপনি মত দিলে, বোধ হয় হরসুন্দর কোন আপত্তি করতে পারবে না।"

আজ তাঁর শিষ্যার জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ কথোপকথন শুনিয়া ও সত্যের জন্য এই অসহায়া বিধবার হৃদয়ের বল অবলোকন করিয়া বৃদ্ধ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নয়নদ্বয় আনন্দোদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিল। তিনি বলিলেন, "মা! মানুষের গড়া বিধির উপরেও যে বিধাতার একটা অদৃশ্য পবিত্র বিধি আছে মাঃ, সেটা উপেক্ষা করতে পারে এমন নরনারী খুব কম। আমি আজই হর-সুন্দরকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে, তার অভিমতটা কি?—জানি," বলিয়া তিনি সে দিন চলিয়া গেলেন। মহামায়ার একবার মনে হইল ঝোঁকের মাথায় অন্যায় কাজ করতে বসিনি ত? এই-রকম নানা চিন্তা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল।

২০

সেদিন রাত্রিতে যখন নগেনকে লালবিহারী রাস্তায় বাহির করিয়া দিল, তখন নগেনের নেশা অনেকখানি কাটিয়া আসিয়াছিল। খানিকদূর টলিতে টলিতে আসিয়া, সে একখানি গাড়ি, ভাড়া করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া কোন গাড়ীই ভাড়া যাইতে স্বীকার করিল না। পথের ধারে একটা 'পানওয়ালার' সহিত বচসা হইলে, সে তাহাকে ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়া দিল। বারান্দার থামে লাগিয়া নগেনের মাথা পূর্ব্বেই কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং জামার উপর অনেক স্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল। অল্প দূর আসিয়া সে দেখিল, শান্তি-রক্ষক পাহারাওয়ালা একটী গ্যাস্‌পোষ্টে ঠেস্ দিয়া অবশিষ্ট রজনীটুকু সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছে। নগেন সেখানে আসিয়া তা'কে ধাক্কা দিয়া বলিল, "তোম্ ক্যায়্‌সা উল্লু হ্যায়, কুছ দেখ্‌তা নেই, হাম্‌কো পান্‌ওয়ালা 'ইন্‌সল্ট' কিয়া হ্যায়, উস্‌কো পাক্‌ড়ো, থানেমে চালান দেও। নেহি ত হাম্ তোম্‌রা নামমে থানেমে রিপোর্ট করেঙ্গে।"

পাহারাওয়ালা তখন নিদ্রার ঘোরে অচৈতন্য ছিল, সুতরাং তাহাকে ধাক্কা দিবামাত্রই সে পড়িয়া গেল, তা'র পাগ্‌ড়ী ছিট্‌কাইয়া নিকটবর্ত্তী ড্রেনের ধারে গিয়া পড়িল এবং তাহাতে কাদা

লাগিয়া গেল। পাহারাওয়ালা অকস্মাৎ এই সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত পাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল এবং নগেনকে সকল প্রকার অকথ্য ভাষায় সম্মানিত করিয়া ইচ্ছামত রুলের গুঁতা দিতে দিতে থানায় হাজির করিল। নগেনের সে রাত্রি হাজতেই প্রভাত হইল। পরদিন মোকদ্দমা হইল। মদ খাইয়া রাস্তায় মার্-পিট্ করার অপরাধ এবং পুলিসের কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধা দেওয়া ও পানওয়ালার দোকান লুট করিবার অপরাধ সব প্রমাণ হইয়া গেল। বিচারে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও এক সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হইল। নগেন সব কথা স্বীকার করিয়া লইল। উকিল দিয়া সে মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিল না। সাতদিন পরে সে জরিমানা দিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল। এ কয়দিন সে জেলে অনেক ভাবিয়াছে। গিরিবালা সেদিন যে তাহার সহিত কেন এমন অন্যায় ব্যবহার করিল, এ রহস্য সে কোন মতেই ভেদ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার মনে হইল, গিরিবালা বোধ হয় তাহার কথায় আর বিশ্বাস করে না। আমি যে ত'াকে বাড়ীওয়ালী করে দেব, এটা একটা স্তোকবাক্য মনে ক'রে সে কি আমাকে মাতাল অবস্থায় বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছিল? হ'তে পারে, এতে তার অপরাধ কি? আমি এমন আশ্বাস আজ সাত বৎসর ধ'রে দিয়ে আসছি। তারপর হরসুন্দরের উপর নগেনের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইল এবং এই অসহ্য অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইলে, হরসুন্দরকে যেমন ক'রে

হ'ক্ জব্দ করতে হবে, তা'কে সকলের সম্মুখে আদালতে দাঁড় করাতে পারলে তবে আমার এ দুঃখ, এ অপমান যাবে। যতদিন পর্যান্ত প্রতিশোধ নিতে না পারি, ততদিন গিরিবালার সহিত আর দেখা করব না, এমনি একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া সে হর-সুন্দরের নামে মোকদ্দমার কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং তার বাড়ীর ঝিকে সুরমার নিকট পাঠাইয়া সুরমার অন্তরটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। সে শুনিয়াছিল, যে হরসুন্দর সুরমাকে দেখিতে পারে না, এ ক্ষেত্রে হয়ত ললিতাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে সুরমার সহানুভূতি সে পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নগেন ঝিকে পাঠাইয়াছিল। যখন ঝি ফিরিয়া আসিয়া সুরমার ক্রোধের ও ঘৃণার কথা ব্যক্ত করিল, তখন নগেনের মন যেন কতকটা মুচড়াইয়া পড়িল, সে মনে মনে যতখানি সুবিধার কথা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সুরমার এই বিপরীত আচরণের আঘাতে সে যেন তার চে'য়ে অনেকখানি বেশী দমিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে নানারূপ চিন্তা করিল, অবশেষে তা'র মনে হইল এ বিষয়ে একবার গিরিবালার সহিত পরামর্শ করিলে হয় না? আজ প্রায় বারদিন সে গিরিবালার বাড়ীর রাস্তা মাড়ায় নাই, সুতরাং গিরিবালা যে কেমন আছে, এ খোঁজটা লওয়াও তার খুব উচিত। বৈকালের দিকে সে গিরিবালার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। আজ যেন কেমন তার লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল। পানওয়ালার দোকানের কাছটা খুব

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, পাছে তা'র সঙ্গে চোখোচোখী হয়। সে বরাবর একনিঃশ্বাসে গিরিবালার ঘরের দ্বারে পৌঁছিল, দেখিল গিরিবালার ঘরে অপর একটী নূতন স্ত্রীলোক রহিয়াছে। গিরিবালার গৃহসজ্জা আস্‌বাব-পত্র কিছুই নাই। স্ত্রীলোকটীকে নগেন এ বাড়ীতে আর কোনদিন দেখে নাই, ভাবিল, তবে কি গিরিবালা ঘর পরিবর্ত্তন করেছে? না অন্য কোথাও উঠিয়া—গিয়াছে? নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ ঘরে কি নূতন এসেছেন? এ ঘরে যিনি থাক্‌তেন তিনি কি উঠে গেছেন?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "বসুন না, আমি আজ চার দিন মাত্র এসেছি, এ ঘরে কে থাক্‌তেন জানিনা, আমি এসে তাঁ'কে দেখিনি? বাড়ীওয়ালী দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সব জান্‌তে পার্‌বেন।"

নগেন সেখানে বসিয়া পড়িল, বলিল "আপনি আমার একটা উপকার কর্‌বেন, একবার বাড়ীওয়ালীকে গিয়ে চুপি চুপি বলুন "যে আমার ঘরে নগেনবাবু বসে আছেন। আপনাকে একবার ডাক্‌ছেন।"

স্ত্রীলোকটী বলিল "আমার নাম বিমলা। আমি মাথাঘষার গলিতে আগে থাক্‌তাম। বাবা! সে বাড়ীতে দিবারাত্রি মদের যে হিল্লোড়্, অনবরত যেরকম মারামারি, কাটাকাটি আমি কি সেখানে টেঁক্‌তে পারি বাবু? সবই যেন ইত্‌রোমী ব্যাপার। না হয় বেশ্যা হ'য়েছি? তা'বলে অত বেলেল্লাপনা কি পারা যায়?"

বলিয়া সে ডাবর হইতে একটী পান বাহির করিয়া নগেনের হাতে দিয়া একটী কটাক্ষপাত করিয়া বাড়ীওয়ালীকে ডাকিতে গেল। অল্পক্ষণ পরে একটী জাঁদ্রেল্ চেহারার বাড়ীওয়ালী সেখানে দেখা দিয়া বলিল, "এই যে নগেনবাবু! এতদিন কোথায় ছিলেন? পথ বুঝি ভুলে গেছ্লেন?"

নগেন কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "গিরিবালা কোথা?"

"সে কথা আর কেন বল বাপু? ছুঁড়ীর যে কি মতিচ্ছন্ন ধর্‌ল তা' বল্‌তে পারি না, অনেক বুঝালাম, বল্লাম লোকের অভাব কি? কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না। সেদিন রাত্রিতে তোমার সঙ্গে যে কি হ'লো তা' তো আর খুলে বল্লে না, তার মনের মধ্যে যেন মস্ত একটা গোল বেঁধে গেছে, সে আধাদামে সব জিনিসপত্র বিক্রী করে চলে গেছে। কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, এখন ঠিক বল্‌তে পারি না তবে বৃন্দাবনে গিয়ে থাক্‌ব।"

বৃন্দাবনের কথায় নগেন চমকিয়া উঠিল। একটা অভাবনীয় কল্পনা-চিত্র মুহূর্ত্তের ভিতর তার নয়নপথে দেখা দিল। নগেন যেন সে দৃশ্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সমগ্র ধমনীর মধ্যে বিদ্যুৎবেগে উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিল না। বাড়ীওয়ালী বলিল, "ভাল কথা মনে প'ড়েছে, গিরিবালা যাবার সময় আমার কাছে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে, বসো আমি সেখানা এনে দি।" বাড়ী-ওয়ালী চিঠি আনিতে চলিয়া গেলে নগেন উদ্বিগ্ন চিত্তে পত্রখানির

আশায় পথ চাহিয়া রহিল। বিমলা একটী সিগারেটের বাক্স নগেনের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি সিগারেট খাবেন?" তখন নগেন বলিল "না, থাক্।" ইতিমধ্যে বাড়ীওয়ালী চিঠিখানি আনিয়া নগেনের হাতে দিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল। নগেনও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। পথে আসিয়া একটা ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একনিঃশ্বাসে পত্রখানি পড়িল। গিরিবালা লিখিয়াছে, "তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না, এই না-দেখা হওয়ার জন্য আমি যে কি পর্যান্ত সুখী তা' বলতে পারি না। আমরা বেশ্যা হ'লেও তোমাদের মত অত ঘৃণ্য ও জঘন্য নই, এ স্পর্দ্ধা করতে পারি। তোমার কথায় আমার জীবনের পথ দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি হরসুন্দরের বা ললিতার কোন অপকারই করতে পারবে না! আমি 'কোর্টে' হাজির হ'য়ে তোমার সকল জালজোচ্চুরী প্রকাশ করে দেব। যদি ভাল চাও ত আজিই তা'দের কাছে ক্ষমা চাও? তোমাদের মত লোকের নিষ্ঠুর আচরণই ত ঘরের লক্ষ্মীদের জোর করে পথে দাঁড় করাইয়া থাকে। ধিক্! এতটুকু মনুষ্যত্ব তোমাদের নাই।"

চিঠি পড়িয়া নগেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঠের পুতুলের মত স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে বাড়ীর দিকে চলিল। সারা রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। বহুবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে পাগলের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে

লাগিল। পরদিন বেলা চারটার সময় পেয়েদা আসিয়া তা'কে মানহানির নালিসের শমন ধরাইয়া গেল। শমন পাইয়া নগেন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বৈকালে সে যখন উকিল-পাড়া দিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন দেখিল যোগেশের আপিসের দরজায় একখানি সেকেণ্ডক্লাস গাড়িতে গিরিবালা আসিয়া উঠিল। নগেন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পরদিন সকালে সে যোগেশের বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে যোগেশ দেখা করিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলে নগেন বালকের মত কাঁদিয়া তাঁর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মত নরাধমকে ক্ষমা করলেও আপনাদের পাপ হ'বে জানি, কিন্তু আমার অপরাধ যদি ক্ষমা না করেন তবে আমি আত্মহত্যা করে মরব। যোগেশ বাবু! বলুন আমাকে মাপ করলেন? আপনি আমাকে রক্ষা না করলে ললিতা বা হরসুন্দর-বাবু কেউ আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না।"

২১

হরসুন্দর আজ কয়েক দিন হইল যোগেশ ও রমেশের পত্র পাইয়াছেন। পত্র পড়িয়া তিনি নিজের জন্য এতটুকু ক্ষুব্ধ নন। ললিতার জন্য তিনি বড় ব্যথা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে এ সংবাদ জ্যেঠাইমা ও ললিতা উভয়েই অবগত আছেন। এরূপ মোকদ্দমা করা উচিত কি না, হরসুন্দর এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলেন, মনে মনে বলিলেন, মোকদ্দমায় আমাদের জিত হইবে সত্য, কিন্তু এই সব ব্যাপার লইয়া ললিতাকে কোর্টে দাঁড়াইতে হইবে, লোকে তখন অনেক কথা মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে ছাড়িবে না। বিবাহের পূর্ব্ব দিন ললিতা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত সে লিখিয়াছিল "......আমি নিশ্চয় মনে কর্‌তে পারি যে কাকার এই আচরণ তোমাকে এতটুকু আঘাত দিতে পার্‌বে না। আমার খুব সাহস ও বিশ্বাস আছে, যে তোমার মুখে আমাকে লজ্জা পাবার মত কোন ভাবই দেখ্‌তে হ'বে না।" ললিতার এই কথাগুলি আজ যেন ভবিষ্যত-বাণী বলিয়া হরসুন্দরের মনে হইল। ললিতা যেন এমন একটা ঘটনা দূর ভবিষ্যতে সুস্পষ্ট দেখিয়া লইয়াছিল। আজ সত্য সত্যই নগেনবাবুর আচরণে তিনি বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইলেন না। বরং যোগেশের

নগেনবাবুর নামে নালিস করার জন্য দুঃখিত হইলেন। যদি এই মোকদ্দমা করিতে হয় তবে ললিতা ও জ্যেঠাইমা কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িবেন। আমার জন্য অকারণ তাঁহাদের একটা কলঙ্কের বোঝা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীলোক অম্লান-বদনে হাসিতে হাসিতে বিশ্বব্যাপী অভিশাপ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে কোন দিন কোন দিক হইতে দুর্ব্বলতার একরত্তি আভাসটুকু পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে জানে না, কিন্তু এত বড় মিথ্যা অপবাদ রক্ত মাংসের শরীর লইয়া আজপর্য্যন্ত কেহ সহ্য করিতে পারে এমন রমণী নাই। হরসুন্দরের মনে হইল একবার জ্যেঠাইমার নিকটে গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলেন, এবং তিনি কি যুক্তি দেন, তাহাও শুনিয়া আসেন। সেদিন যখন জ্যেঠাইমা নিকটে বসিয়া খাওয়াইলেন, তখন একবার মনে করিলেন নগেনবাবুর সমস্ত ব্যবহার খুলিয়া বলেন, কিন্তু কেমন একটা অজানা দুঃখ যেন তাঁ'র চর্তুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিয়া আনিল। ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যেন সত্যটা প্রকাশ করিতে গিয়া কেমন থামিয়া পড়িলেন। মহামায়া কিন্তু সে দিন, গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে যখন বলিলেন, "সুন্দর! তোর সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে রে?" হরসুন্দর "কি পরামর্শ", জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ নয়, আমি নিজে আগে একটু ভেবে দেখি, তার পর যদি প্রয়োজন মনে করি তবে তো'কে জানাব এখন।" সেই দিন হইতে ঐ কথাটাও হরসুন্দরের

মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল, কিন্তু জ্যেঠাইমাকে তিনি ভাল জানিতেন, সুতরাং বলিবার হইলে তিনি আপনিই তাঁহাকে যে ডাকিয়া বলিবেন একথা নিশ্চিত; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই, তবে কি এ সংবাদ তিনি অবগত হইয়াছেন? আজ যেন হরসুন্দরের মনে হইল, হয়ত তাহাই হইয়াছে! তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তখন জ্যেঠাই-মার নিকট গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এমন সময়ে শৈলবালা আসিয়া বলিলেন, "একজন সন্ন্যাসী তোমাব সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" হরসুন্দর শশব্যস্তে ঘরের বাহিরে আসিয়া মহামায়ার গুরুদেবকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

গুরুদেব হরসুন্দরকে আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া বলিলেন "খুব বিস্মিত হয়েছ, না? আমি তোমার কাছেই এসেছি বাবা।" তারপর সাদরে হরসুন্দরের হস্তধারণ করিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল ঘরে গিয়ে বসি।"

হরসুন্দর অধিকতর বিস্মিত হইয়া, বলিলেন "আমার কাছে এসেছেন! কি প্রয়োজন বলুন?"

তিনি বলিলেন, "আজ তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে গোটা দুই কথা কইতে চাই, তুমি কি ব্যস্ত আছ?"

হরসুন্দর বলিলেন, "না, আসুন ঘরে কেউ নাই, আপনি অনায়াসে বলিতে পারেন।"

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, "আমি সন্ন্যাসী হ'লেও গৃহীর প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, সেজন্য অবশ্য তোমার মনে নানা কথার উদয় হ'তে পারে, কিন্তু এটা জেনো, জীবের মঙ্গল ও আনন্দ দেখাই হচ্ছে সাধনার প্রথম সোপান। তোমাদের ভালবাসা, আমাকে তোমাদের নিকট ডেকে এনেছে। মহামায়া ও ললিতাকে আমি বড়ই স্নেহ করি।' ইহারা হিন্দুঘরের আদর্শ চরিত্র। ললিতা যে তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী সে সব আমি শুনিয়াছি, সেজন্যই আজ তোমার কাছে এসেছি।"

হরসুন্দর একদৃষ্টিতে গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, আজ এসব কথা তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

গুরুদেব বলিলেন, "কেবল যে আমি ললিতার বিষয়টা ভাব্‌ছি তা নয়, সুরমার কথাও আমার খুব মনে আছে। নগেন-বাবু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে কি জঘন্য পথই গ্রহণ করেছেন, তাও তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ। এইসব ব্যাপার মহামায়াকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে, বুঝতে পার্‌ছ ত? তার কথা হ'চ্ছে জীবন থাক্‌তে সে তোমাকে বা ললিতাকে সমাজের কাছে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা ঘাড় পে'তে নিতে দেবে না।"

হরসুন্দর বলিলেন, "মিথ্যাকে এত ভয় পেলেত সংসারে থাকা চলে না! পদে পদেই মিথ্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নব নব উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে হয়। মিথ্যা অপবাদ যদি সমাজ ঘাড়ে চাপাবার জন্য অগ্রসর হ'য়ে থাকে, তবে সত্যি নিয়ে

তার সঙ্গে লড়াই করতে হ'লে যে গায়ে কোনরূপ মিথ্যার আঁচড় লাগবে না এমন প্রতিশ্রুতি কেউ দিতে পারে না।"

গুরুদেব বলিলেন, "এটা নিশ্চয় জেনো আমি কোন দিনই মিথ্যাকে অবলম্বন করে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে উৎসাহিত করব না। একজন হীন প্রবৃত্তির বশে যদি হিংসা করে তবে তোমাকে যে প্রতিহিংসা করে তা'র প্রতিশোধ নিতে হ'বে এমন যুক্তি আমি কখন দিব না। যা সত্য, যা ধর্ম্ম, তাই করতে পরামর্শ দেওয়াই হচ্ছে আমার কর্ত্তব্য। মহামায়া তা'র দেবরের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়েছে, সে কথা তুমিও বুঝতে পাচ্ছ যে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে সে ঘর করে। এতখানি অন্যায়, এত বড় একটা কলঙ্ক সে ললিতা বা তোমার দিক হইতে অম্লানবদনে মেনে নিতে রাজি নয়। তা'র এই কয় দিন একরূপ আহার নিদ্রা নাই।"

হরসুন্দর বলিলেন, "তিনি কি করতে চান্? মোকদ্দমা করে নগেনবাবুকে শাস্তি দেওয়াতে চান্?"

গুরুদেব বলিলেন, "না তা'র সেরূপ কিছু অভিপ্রায় নাই কি করা উচিত এ সম্বন্ধে আজ কয়দিন তা'র সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হ'য়েছে, শেষে বুঝলাম তা'র একান্ত ইচ্ছা তুমি তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী ললিতার পানিগ্রহণ কর, তাহ'লে নগেনবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়ে যাবেন এবং তাঁ'র সকল চেষ্টা শূন্যে গৃহ-নির্ম্মাণের মত শূন্যেই মিলাইয়া যাইবে।

মহামায়া ললিতাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কি বল ?"

হরসুন্দর এই কল্পনাতীত প্রস্তাব শুনিয়া হর্ষে, বিস্ময়ে, কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এমন একটা অসম্ভব প্রস্তাব যে গুরুদেবের মত লোক কোন দিন করিতে পারেন, প্রথমেই এই প্রশ্ন তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আজ মুহূর্ত্তের ভিতর বিদ্যুৎ-বেগে যেন ললিতার সহিত তাঁহার বিবাহের সকল আয়োজন স্মরণ করাইয়া দিল। বায়স্কোপের চিত্রের মত একে একে অতীত দিনের আনন্দ-উদ্বেগ-সরম-সঙ্কোচ-পরিপূরিত দৃশ্যাবলী তাঁহাকে বালকের মত চঞ্চল করিয়া দিল। হরসুন্দর আজ যেন তাঁ'র বর্ত্তমান অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, তাঁহার অন্তর্নিহিত তপস্যা যেন ইষ্টসিদ্ধির সম্মুখীন হইয়া স্তম্ভিত ও চকিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তাঁ'র দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষে যেন আজ নিখিল বিশ্ব ভক্তি-শ্রদ্ধা-করুণা-প্রীতি-প্রেমে ভরিয়া উঠিল। এ মিলনের মধ্যে হরসুন্দর দেখিলেন, দুর্ব্বল মানুষের হাত নাই! পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল একথা কি সত্য ? তা যদি হ'তো তা'হলে এতদিন এ মিলন কোন্ কালে হইতে পারিত। যে বালিকা বিবাহের দিন, লিখিতে পারিয়াছিল "তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার বোধ হয় সমাজ আর আমার রাখ্‌বে কিনা জানি না,

তুমি বোধ হয় আমাকে পত্র লেখা উচিত নয় বিবেচনা ক'রে লিখ্‌বে না।" এতখানি মনের জোর নিয়ে যে ঘর করে আজ সে কি, তা'র কাকার এই হীন আক্রমণের হাত হ'তে রক্ষা পেতে অসহায় উপায়হীনের মত সমাজের ভয়ে আপনাকে শৃঙ্খলিত করতে কোন কষ্ট পাবে না? তা হ'তেই পারে না—এ শুধু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া!

হরসুন্দরকে চিন্তান্বিত দেখিয়া গুরুদেব বলিলেন "কি ভাবছ বাবা? এর মধ্যেতো এতটুকু অশাস্ত্রীয় কাজ হ'বে না, বেশ করে বুঝে দেখ, তুমিত ছেলে মানুষ বা মূর্খ নও।"

হরসুন্দর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার কথার প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা ব'লে আমার মনে হয়—তথাপি দুই একটা কথা না বল্লে আমার মনের ভাব গোপন করা হয়।"

গুরুদেব বলিলেন "নিশ্চয় বল্‌বে, না বল্লে আমি অসন্তুষ্ট হ'ব? মনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে উপদেশ দিতে পারি না, তেমন কাজ করে চিরদিন অনুতাপ করতে হয় সে কথা খুব মনে রেখো। অনুরোধের কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও, কর্ত্তব্য হিসাবে যা ভাল বুঝ্‌বে, এবং তা যদি আশাস্ত্রীয় হয় তথাপি তা' করাও উচিত নয় একথাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌বে। যাদের কোন কিছু গড়ে তোল্‌বার শক্তি নাই, তা'দের কোন কিছু ভেঙ্গে ফেল্‌বার শক্তিটাই যে তা'দের ক্ষমতা একথা একটা মস্ত ভুল বলে জেনো। সমাজে যাঁরা গড়্‌তে পারেন, তেমন শক্তি-শালী মহাপুরুষগণই প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করার দাবী রাখেন,

তবে আমাদের বর্ত্তমান যুগে সমাজের যে, স্থানে স্থানে আমূল পরিবর্ত্তন সত্বর সর্ব্বদিক হ'তে প্রয়োজন হয়েছে, সে কথাও ভুল্লে চল্‌বে না ?"

নিতান্ত অনাবৃষ্টির দিনে, মেঘলেশহীন আকাশে অকস্মাৎ মেঘ সঞ্চারিত হইতে দেখিলে, দরিদ্র কৃষকের মনে যে বিপুল আশা ও দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার কথা ধ্বনিত হইয়া উঠে, আজ গুরুদেবের কথা তেমনই করিয়া হরসুন্দরের কর্ণে অভাবনীয় আশ্বাস বাক্য প্রদান করিল। কিন্তু হরসুন্দর দেখিলেন, যেমন করিয়া তিনি তাঁর মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন না কেন, অবস্থা ও সমাজকে ফাঁকি দিবার যেন একটা খুব লুকান চেষ্টা অদৃশ্য কণ্টকের মত তাঁহাকে বেদনা দিতেছিল। ললিতা কোনদিন, তাহাকে কোনরূপ পত্রাদি দেয় নাই, তিনিও ললিতাকে কোনদিন পত্র দেন নাই বা তাহার সহিত সাক্ষাতও করেন নাই। মনের পূজা মনই করিয়াছে ও করিবে, তবে কি কারণে আজ এত বড় একটা সমাজ-ভয়-ভীত দায়িত্ব ঘাড় পাতিয়া লইবেন। ইহাতে ললিতা কি সুখী হইতে পারিবে ? সমাজ কি তাহাকে পদে পদে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে না ! সকলের নিকট কি সে আপনাকে ছোট মনে করিবার যথেষ্ট আঘাত পাবে না ? বিদ্রূপ বা ঘৃণা কি তাহাকে অপদস্থ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'বে ? সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার মত বড় মন লইয়া কয়জন এগিয়ে আসবে ? যে লজ্জা বা অপমানের হাত হ'তে মুক্তি পাবার জন্য

জ্যেঠাইমা আজ এত ব্যস্ত, এ বিবাহ সেটাকেই চির দিনের জন্য ললিতার মাথার উপর তুলে দিবে না কি ?

গুরুদেব বলিলেন, "বাবা ! জোর ক'রে কোন কাজ করা উচিত নয়। তোমাদের ভালবাসা পবিত্র ও স্বর্গীয়, এর মধ্যে কোনরূপ কামগন্ধ নাই, সুতরাং কোন প্রকার নিন্দা তোমাদের স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা আমি বেশ জানি, প্রকৃত প্রেমের মধ্যে দ্বেষ-হিংসা, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই নাই। তোমার কথা শু'নে আজ আমি সত্য সত্যই প্রচুর আনন্দ লাভ করলাম। প্রেমিকের প্রাণ কুসুম হ'তেও কোমল কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে বজ্র হ'তেও কঠোর হয়ে থাকে। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের এই প্রেমের তপস্যার ফল ভগবান স্বয়ং আসিয়া দিন। বাবা ! আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আমি এখন বিদায় হইব, প্রেমের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হচ্ছে, তা'তে আবেগ থাক্‌বে কিন্তু মোটেই উদ্বেগ থাক্‌বে না। এই অপূর্ব্ব ভাবটী আজ তোমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশলাভ কর্‌তে দে'খে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি।"

হরসুন্দর বলিলেন, "পরের জন্য জ্যেঠাইমার অন্তর কতখানি উদ্বেলিত হ'য়েছে তা আমি অন্তরের সহিত উপলব্ধি কর্‌ছি, তাঁ'র মত খাঁটি মানুষ আমি দেখিনি, তাঁকে দেবীর মত মনে মনে ভক্তি ও পূজা ক'রে থাকি। আমি আজই একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করব।"

গুরুদেব বলিলেন "বাবা! এ উত্তম পরামর্শ। তোমার মুখ থেকে এই সব উত্তর শুনব ঠিক করেই এসেছিলাম। তোমার কথা আজ আমাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে তোমার পবিত্র প্রেমের সাধনা কত উচ্চ স্থান লাভ ক'রেছে। এখন আসি বাবা, প্রেমময় তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমার আশীর্বাদ।" গুরুদেব চলিয়া যাইলে হরসুন্দর জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

শৈল হরসুন্দরকে এত বেলায় বাহিরে যাইতে দেখিয়া, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "দাদা এখন কোথায় যাচ্ছ, জলটল্ খে'য়ে যাও, আস্তে হয় ত দেরী হ'বে।"

হরসুন্দর বলিলেন, "নিয়ে আয়, তোকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত।"

২২

মহামায়া আজ কয়েকদিন যেন কি একটা গভীর চিন্তায় সর্ব্বদা আপনাকে অন্যমনস্ক রাখিয়াছেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখের উপর সে নিরবচ্ছিন্ন হাসি দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় তিনি মালা জপিতে জপিতে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। মালা ঘুরাইতে ভুল হইয়া যাইতেছে, একথা স্মরণ হইলেই, তিনি তখন অভ্যাসের বশে আবার মালা ঘুরাইতে থাকেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ পরদুঃখকাতর অন্তরটা কে যেন নির্ম্মমভাবে পীড়ন করিয়া যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছে এবং তাহারই হীন উল্লাস তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উৎসাহভরে চতুর্দ্দিকের বাতাসকে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। মহামায়ার এতখানি বয়স হয়েছে কিন্তু কখন স্বপ্নেও এমন একটা অমানুষোচিত অন্যায় আঘাত পান নাই। এমন একটা ভীরুজনোচিত প্রতিহিংসা কেহ কখন লইতে সাহস করিতে পারে, এমন অভিজ্ঞতাও কোন দিন তাহার কল্পনায় আসে নাই। রমণীর সব চেয়ে গর্ব্ব করিবার জিনিস যেটা, সেটার উপর সে কোন দিক থেকে কোনরূপ আঘাত মোটেই সহ্য করিতে পারে না। সকল ধৈর্য্য, সকল বিবেক, সমস্ত বুদ্ধি সেখানে আত্মহারা অবস্থায় কর্ত্তব্য-বিমুখ হইয়া পড়ে। মহামায়া

নগেনের এই অন্যায় আচরণটী কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অসম্ভব ধৈর্য্য, অভাবনীয় উপেক্ষা, কোনটাই যেন আজ তাঁহার নিকট পায়ের উপর জোর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। এ কয়দিন তাঁহার মনের ভিতর যে কি তুমুল বিচার-সংঘর্ষ চলিয়াছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। নিজের জন্য তাঁ'র এতটুকু চিন্তা, লজ্জা, বা ক্ষোভ কখনই মনে আসে নাই। কেবল তাঁ'র স্নেহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-পরায়ণা সংসার-অনভিজ্ঞা ললিতার আনন্দবিহীন উৎসাহহীন মলিন মুখখানি তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। আর অপর দিক হইতে নির্দ্দোষ হরসুন্দরের এত বড় একটা মিথ্যা অপবাদেও উদ্বেগবিহীন অসম্ভবরকমের গম্ভীর মুখখানি যখন মহামায়ার নয়নসম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি যেন হরসুন্দর বাহিরে প্রকাশ না করিলেও কতখানি অসহ্য যন্ত্রণা তাহার হৃদয়কে নির্দ্দয়রূপে পীড়ন করিতেছিল, তাহা তিনি নিজের সমস্ত অন্তর দিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলেন বলিয়াই মহামায়া এতটা অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। আলো না হ'লে যেমন আলো জ্বালা যায় না, বেদনা অনুভব করার মত প্রাণ না থাকিলে, বেদনা জিনিসটাও সেইরূপ তা'র নিকট চিরদিন অনাস্বাদিত থাকিয়া যায়। মহামায়া আজ আহ্নিক শেষ করিয়া অনেকক্ষণ আসনে বসিয়া রহিলেন। ললিতা মহামায়ার এ ভাবান্তর যে ধরিতে পারে নাই তা' নয়, তবে সে নিজে

হইতে এ বিষয় লইয়া জ্যেঠাইমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় মনে করিয়াছিল। কারণ ললিতা জানিত, জ্যেঠাইমা তাহাকে কোন কথাই গোপন করেন না।

মহামায়া ডাকিলেন, "ললিতা! এখানে আয় ত মা।"

ললিতা আসিলে জ্যেঠাইমা অত্যন্ত স্নেহ-করুণকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সাম্‌নে বস্ মা, তোর সঙ্গে আজ কদিন যেন ভাল করে কথা কইনি, না রে?"

ললিতা জ্যেঠাইমার নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল "কেন ডাকছ জ্যেঠাইমা?"

মহামায়া বলিলেন, "সে দিন তো'কে একটা কথা বল্‌বো মনে ক'রে তখন বলিনি, আজ সেই কথাটা আর না বলা ঠিক নয় মনে কচ্ছি।" তারপর ললিতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তুই আমার তেমন মেয়ে নোস্ ত, আমার কথা ঠেল্‌তে পারবি না তা জানি। ঠাকুরপোর কাণ্ডটা এ বয়সে সত্যি সত্যি আমাকে একটা অসহ্য দুঃখ দিয়েছে, এর প্রতিশোধ নিতে আমার সমস্ত অন্তরটা নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে। এ বয়সে মেয়েমানুষের এতখানি রাগ ভাল নয় তা জানি, সে জন্য এ কয়-দিন মনের সঙ্গে অনেক লড়াই ক'রেছি রে ললিতা, কিন্তু আমারই রায় ঠিক আছে, এতটুকু হঠে নাই। ঠাকুরপো যদি তা'র দুঃখ কষ্ট জানিয়ে আমার কাছ হ'তে সমানে বিষয় চেয়ে নিতো তা'হলে আমি বিনা আপত্তিতে তা'কে সব লিখে দিতাম, অথবা

সে যদি সে পথে না গিয়ে কৌশল ক'রে আমাদের শুধু ঠকিয়ে নিতো তা'ও হয় ত সহ্য হ'ত, কিন্তু এত বড় একটা মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে আমাদের বিষয়সম্পত্তি হ'তে অকারণ বঞ্চিত করবার অপরাধ সহ্য ক'রে নেওয়ার মধ্যে গুরুতর পাপ আছে এবং সে পাপের জন্য ভগবানের নিকট আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে ও দণ্ড নিতে হ'বে। অন্যায় করাও যেমন পাপ, অন্যায় করতে দেওয়াও তার চেয়ে অধিক পাপ এটা সর্ব্বদা মনে রাখিস্ রে ললিতা। আমার ইচ্ছে হরসুন্দরের সঙ্গে তোর বিবাহ দি। এ বিষয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি; এক হিসাবে তুই হরসুন্দরের বাগ্‌দত্তা পত্নী।"

ললিতা একথা শুনিয়া কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। সহজ ভাবেই উত্তর দিল, "এতে কি লাভ হবে জ্যেঠাইমা? কাজটাই যদি বেশ সঙ্গত মনে কর তবে এ বিবাহ ত অনেক দিন পূর্ব্বেই হ'তে পারত। আমার মনে হয়—এ যেন আমরা ভয় পে'য়ে ধরা দিচ্ছি।"

মহামায়া বলিলেন, "লাভ এ ক্ষেত্রে ঠাকুর-পোকে জব্দ করা, তার মতলবটাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া। ঠিক ভয়ের কথা কি আছে?"

ললিতা বলিল, "এর বেশী বোধ হয় আর কিছু সার্থকতা নাই? তারপর কথা হচ্ছে, আমাদের স্বার্থের জন্য আর

এক জনের ঘাড়ে এত বড় একটা ভার দেওয়া কি ঠিক মনে কর জ্যেঠাইমা ?”

মহামায়া বলিলেন, “হরসুন্দর বোধ হয় আমার কথা অন্যথা করতে পারবে না, তোদের মনের কথা ত আমার কাছে কোন দিন গোপন করিস্ না। তা’র উপর আমার ভরসা আছে ব’লেই বলছি।”

ললিতা বলিল, “আমার বোধ হয় মনের কথা সব সময় বাইরে আনার মধ্যে অনেক ক্ষতি হ’তে পারে। দেবতার পূজা যখন মনের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন বাহিরের প্রতিমার বোধ হয় কোন প্রয়োজনই থাকে না।”

মহামায়া বলিলেন, “ললিতা তোর কথা ঠিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—তবে পূর্ব্বেই ব’লেছি, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাও হ’চ্ছে পাপ, এটা শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ, জানিস্। দৈহিক মিলনের প্রত্যাশায় বিবাহ করতে জ্যেঠাইমা তোদের কোন দিন অনুরোধ করবে না, এ কথা খুব ঠিক জানিস্।”

ললিতা আর কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মহামায়া বলিলেন, “হরসুন্দরের মন না জেনে, কোন দিন এ পথে তো’কে অগ্রসর হ’তে দেব না।”

ললিতা বেশ বুঝিয়াছিল, যে কেন জ্যেঠাইমা এ পথে এতদূর অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যাদের ভালবাসেন, তাদের উপর কোনরূপ অন্যায় আচরণ তাঁ’র অসহ্য। আজ জ্যেঠাইমার

অন্তরের মধ্যে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা ললিতা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতেছিল; এবং সেজন্য যে জ্যেঠাইমা এই বিবাহরূপ অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, একথা আর ললিতার বুঝিতে বাকী রহিল না।

মহামায়া বলিলেন, "বেলা অনেক হ'য়ে গেল, না বে, আমি শীগ্‌গির স্নান আহ্নিক সেরে আসি" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ললিতা মনে মনে জ্যেঠাইমাকে স্বর্গের দেবী ভাবিয়া প্রণাম করিল।

২৩

হরসুন্দর ডাকিলেন, "জ্যেঠাইমা ?"

ললিতা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তিনি এইমাত্র স্নান করতে গেছেন।"

হরসুন্দর বলিলেন, "জ্যেঠাইমা এলে ব'লো আমি আবার বিকালে আসব।"

ইতিমধ্যে ললিতা একখানি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, "বসো, তিনি শিগ্‌গির আস্‌বেন ব'লে গেছেন।"

এই কথাগুলি বলিতে ললিতা সে দিন কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না। খুব সহজ ও সরলভাবে সে হরসুন্দরকে বসিতে অনুরোধ করিল। হরসুন্দর দেখিলেন, সে মুখের উপর সেই স্বাভাবিক প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে। এত বড় একটা অপবাদ ললিতাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই দেখিয়া হরসুন্দর মনে মনে গর্ব্বিত হইলেন। একটা অপূর্ব্ব জয়শ্রী আজ যেন ললিতার নারীত্বকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। ললিতার আচরণের মধ্যে কোনখানে একটুখানিও বাধ বাধ ভাব দেখিতে পাইলেন না। ললিতার বর্ত্তমানের ভাবটা হরসুন্দরের মনে একটা অনাবিল শান্তি দান করিল। হরসুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন।

ললিতা একখানি রেকাবে কিছু জলখাবার দিয়া বলিল "বোধ হয় সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়ে এখনো বাসায় ফেরা হয় নাই, অনেক বেলা হ'য়েছে, একটু জল খাও।"

হরসুন্দর যে দিন প্রথম বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, সে দিন নাকি ললিতা জলখাবার দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা তাঁ'র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। আজ অত্যন্ত আগ্রহভরে নিঃসঙ্কোচে হরসুন্দর রেকাবি হইতে মিষ্টান্ন তুলিয়া লইলেন এবং মনে করিলেন, সত্য যতক্ষণ নির্ম্মল না হয় ততক্ষণ সঙ্কোচ, সরম, লজ্জা তার পূর্ণ-জ্যোতিঃ বিকশিত হইতে দেয় না। তিনি ললিতার জন্য যতখানি বেশী করিয়া ভাবিয়াছিলেন, ললিতা তার নিজের আচরণের মধ্যে ততখানি বেশী করিয়া চিন্তাহীনতাই প্রকাশ করিল।

ললিতা হরসুন্দরের নিকট আসিয়া বসিয়া বলিল, "আজ অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে এমন ক'রে কথা কবার অবকাশ পেলাম।"

হরসুন্দর বলিলেন, "আজ অনেক দিন পরে তোমার কাছে ব'সে তোমার কথা অসঙ্কোচে শোন্‌বার মত হৃদয় লাভ কর্‌লাম, ললিতা!"

ললিতা বলিল, "আমি সব কথা শুনেছি এবং মনে মনে খুব হেসেছি; যাক্! এখন তোমার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে, তুমি ভিন্ন আর কেউ দিতে পার্‌বে না। ললিতার জোর ক'রে, আব্দার ক'রে চা'বার মত জিনিস এতদিন তোমার

জিম্মায় আছে। সে আজ তা'র সেই অমূল্য সম্পত্তি পৃথিবীর চক্ষে ফিরিয়ে নিতে চায়। তুমিও আজ হাসিমুখে ফিরিয়ে দাও। বিবাহরাত্রির মত তোমার আনন্দ ও ত্যাগের মধ্যে আমাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে, তোমার ধ্যানের মধ্যে, আমার জীবনের সমাধি-লাভের সুযোগ ক'রে দিতেই হবে।"

হরসুন্দরের নয়ন বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভরিয়া গেল। তিনি স্থির-কণ্ঠে বলিলেন, "ললিতা! কি করতে হবে বল—আমি কি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারব না এমন আশঙ্কা আছে মনে কর?"

"মনে করি না ব'লেই আজ আমার জোর ক'রে চা'বার জায়গায়ই দাবী করছি।"

হরসুন্দর অনিমেষনয়নে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ললিতা বলিল "একমাত্র তুমি ভিন্ন জ্যেঠাইমাকে কেউ এ কাজ হ'তে নিরস্ত করতে পারবে না। তিনি একবার যা করবেন ঠিক ক'রে বসেন—তা ত তুমি জান, কেউ তাঁকে তা থেকে হঠাতে পারে না।"

হরসুন্দর বলিলেন, "এ ভার সত্যসত্যই আমার। আমি তাঁ'কে বোঝাব।. তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

ললিতা গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিয়া হরসুন্দরের পা:ধূলি গ্রহণ করিল, বলিল, "জ্যেঠাইমার স্নেহই তাঁ'কে বিচলিত ক'রেছে?"

হরসুন্দর বলিলেন "আমি সব জানি কিন্তু—"

হরসুন্দরের কথায় বাধা দিয়া ললিতা বলিল, "সমাজের ভয়ে এমন একটী কাজ করা নিজেদের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। এমন ক'রে কোন কাজ করার মধ্যে সমাজের অমঙ্গল করা ছাড়া আর কিছু করা হয় না, এ কেবল সমাজের কাছে অনন্যোপায় হ'য়ে মাথা হেঁট করে দাড়ান। এর মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্বের পরিচয় নাই। এ কেবল মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া।"

ললিতার কথায় হরসুন্দর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি ললিতার নিকট হইতে এমনই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। আজ হরসুন্দরের প্রণয় যেন ললিতার নিকট আরো প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

ললিতা বলিল, "দেহের সম্বন্ধ কেবল মোহের সম্বন্ধ, এর কোন মূল্য নাই, এ সম্বন্ধের কোন্ ছায়া যেন আমাদের মনের মধ্যে কোন দিন না আসে। আমার শেষ অনুরোধ, আমার শেষ আব্‌দার—এখন থেকে আমাকে সুরমার মধ্যেই দেখ্‌তে পাবে। সুরমা তা'র অসাধারণ প্রেম দিয়ে আমাদের উভয়ের হৃদয় তা'র নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছে। পবিত্র প্রণয়ের আদর্শ-প্রতিমা সমাজ যদি কোন দিন চোখ চে'য়ে দে'খতে চায়, তবে সুরমার মধ্যেই দেখ্‌তে পাবে। আজ একবার স্বীকার কর, তুমি যদি সত্যসত্যই আমাকে চাও, তবে সুরমার মধ্য দিয়াই গ্রহণ করবে,

এবং তেমন করেই তোমার ভালবাসা আমাকে গৌরবগর্ব্বে সমাজের নিকট মাথা তুলে দাঁড়াবার পূর্ণ অধিকার দান করবে।” তারপর ললিতা প্রেম-বিহ্বল অবস্থায় হরসুন্দরের দুইটী হাত নিজের হাতের মধ্যে অসীম আগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “বল তুমি, সুরমাও যে, ললিতাও সে, দুই মিশে গিয়ে এক সুরমা হ'য়েছে? আমার সর্ব্বস্ব আজ সুরমার হাত দিয়ে তোমার পা'য়ে অর্পণ করলাম, আজন্মের অতৃপ্তি আজ সুরমার মধ্যে গিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করলে” বলিয়া ললিতা হরসুন্দরের বক্ষের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হরসুন্দর পাথরের মানুষের মত নির্ব্বাক হইয়া ললিতার মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন, “ললিতা!”

ললিতা চাহিয়া দেখিল সে হরসুন্দরের বক্ষের উপর মাথা দিয়া রহিয়াছে। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিল, “কি বলছ?”

হরসুন্দর বলিলেন “এতদিন পরে ললিতা! আমার তপস্যা সিদ্ধ হ'য়েছে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, সুরমার মধ্যে তোমাকে বরণ করে নেবো। আজই আমি কলকাতা যাব। কিন্তু তুমি যে আমাকে ধরা দিলে, তার জন্য তোমাকে আমি যা দেবো তা তোমাকে গ্রহণ করতেই হ'বে।”

ললিতা বলিল, "তোমার দান কি আমি উপেক্ষা করতে পারি? নিশ্চয়ই নেবো।"

হরসুন্দর বলিলেন, "আমার বিষয়ের সিকি তোমাকে দিয়েছি। সেই টাকায় তুমি এখানে 'ললিতা-কুঞ্জ' নাম দিয়ে একটী দেবালয় স্থাপন করবে এবং জ্যেঠাইমার সেবায় নিযুক্ত থাকবে? বল।" ললিতা বলিল, "বেশ কথা; থাকব।" তারপর ললিতা তা'র গহনার বাক্সটী আনিয়া বলিল, "অনেকদিন এগুলি পরি নাই, এখন পরতে বড় ইচ্ছা করে, সুরমাকে পরতে দিও, আমার অনুরোধ জানিও, তা'হলেই আমার সাধ মিটবে।"

হরসুন্দর বলিলেন, "আমরা, যখন ইচ্ছা এসে, তোমাদের এখানে শান্তি পাব।" হরসুন্দর মহামায়াকে সব কথা বলিয়া সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইলেন। বিজয়বাবু ও শৈলবালাও হরসুন্দরের সঙ্গে কলিকাতা গেলেন।

উপসংহার।

মহামায়ার নিকট নগেনবাবু ক্ষমা চাহিয়াছেন। তিনি ও ললিতা তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নগেনবাবুকে দানপত্র করিয়া দিয়াছেন। নগেনবাবু নেশা পত্র ছাড়িয়া এখন খাটীর মানুষ হইয়াছেন। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি ললিতাকুঞ্জে অবস্থান করেন। গিরিবালার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। হরসুন্দর তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন

মহামায়া ও ললিতা এখন নবনির্ম্মিত 'ললিতা-কুঞ্জে' বাস করিতে-ছেন। তাঁহারা আর কলিকাতায় ফেরেন নাই।

সুরমা বহু অর্থব্যয় করিয়া সরলার ভ্রাতার সহিত কনকের বিবাহ দিয়াছে।

সেদিন সকাল বেলা হরসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া শৈলবালা বলিল, "কি দাদা! তুমি না ব'লেছিলে বৌ-দিদি আমাকে চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে নিয়ে যাবেন না? আজ আমরা চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে যাব। কাল তোমাকে বিজয়ার ভাসান দেখাতে হবে।"

হরসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "তোকে আঁটা দায় দেখ্‌ছি"।

এমন সময় সরলা আসিয়া বলিল, "শৈল! কাল তোমার ভাই! থিয়েটার দেখ্‌তে যা'বার নেমন্তন্ন, যেন মনে থাকে।" সেখানে সুরমা বসিয়াছিল, সে বলিল, "আমার একবার বৃন্দাবনে জ্যেঠাইমা ও ললিতাদিদিকে দেখে আস্‌বার ইচ্ছে হ'চ্ছে।" একথায় হরসুন্দর লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন "সেই কথাই ঠিক। চল সুরমা, তোমাকে একবার জ্যেঠাইমার কাছে নিয়ে যাই।"

সমাপ্ত।